‘সেই সময়’: উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মদর্শন আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় সন্ধান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসটি উনিশ শতকের চালচিত্রে জীবিত মানুষের গদ্যগাথা। ‘সেই সময়’ উপন্যাসের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটির দ্বিতীয় খন্ড। উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে ‘বঙ্কিম পুরস্কার’ এবং ১৯৮৫ সালে ‘আকাদেমি পুরস্কার’-এ সম্মানিত হয়েছে। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন এমন একটি বিশেষ সময়কে যখন বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে মধ্যযুগের নির্মোক ত্যাগ করে পৌঁছেছিল আধুনিকতার পথে। ‘লেখকের কথা’ অংশে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন, “আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। এবং এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, ‘১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ সবদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল’। তিনি যাকে ‘নবযুগ’ বলেছেন পরে তারই নাম হয় ‘বেঙ্গল রেনেসাঁস’ এবং সে বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেসাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। অনেক দিন ধরেই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা আছে। তিনি যে বিংশতি বর্ষের কথা বলেছেন, আমার ধারণা গত শতাব্দীর মূল ঘটনা কেন্দ্রটি তার কিছু পরে। তাছাড়া নবযুগ বা নবজাগরণ সত্যিই কি সারাদেশে এসেছিল, না তা শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল

এবং তা নিয়ে ঢক্কানিনাদ হয়েছে, এই প্রশ্ন আমি নানা কাহিনী সূত্রে উত্থাপন করেছি বার বার।”[১]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গবেষকের দৃষ্টিতে সন্ধান করেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারণাকে। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের যুগবিভাগ করতে গিয়ে সুধী সমাজ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং ১৮০০ সাল থেকে তাঁরা ধরেন আধুনিক যুগের সূচনাকাল। ১৭৫৭ র পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার কয়েক দশকের মধ্যেই আধুনিক যুগের সূচনা হওয়া নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা নয়। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এদেশে বাণিজ্য দখল করতে এসেছিল বিদেশী বণিক জাতি, তাদের সঙ্গে এসেছিল পাশ্চাত্য নবজাগরণের ঢেউ, শিল্প বিপ্লবের প্রবাহ, স্বাধীন চেতনা, বিজ্ঞান চেতনার জগৎ। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহে বাঙালীর স্থবির জীবনে এসেছিল নতুন গতি। বাঙালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবন এমন কি বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও তার চিরায়ত প্রবাহ ত্যাগ করে নিয়েছিল নতুন বাঁক, অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়কে ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেছিল নবযুগের প্রথম আলোকময় প্রভাত।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ জীবনে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল পরস্পর বিপরীত দুটি স্রোতধারা। একদিকে বেশ্যাবিলাস, মদ্যাসক্তি, বাল্যবিবাহ, নারীর বৈধব্য যাতনা, বাবু কালচারের পুরোনো প্রথা সংস্কার যেমন ছিল সমাজে বহমান, সঙ্গে এসেছিল নতুন স্রোতধারা। পাশ্চাত্য চেতনার আলোকে ঘুমন্ত ভারতবাসী জেগে উঠেছিল নতুন প্রভাতে। সকালের ঘুমলাগা চোখে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করার আবেগে ভেসে গিয়েছিল তৎকালীন নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ, তাদের কাছে ইংরেজ আগমন ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। ইংরেজ আগমনে এদেশে এসেছিল বহুকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও শৃঙ্খলার শাসন, আপাত ন্যায়ের শাসন। তাই উনিশ

শতকের প্রথম ভাগেই এদেশের নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ চায়নি ইংরেজ শাসনের অবসান। সভ্য জাতির আলোকে তারা আলোকিত করে তুলতে চেয়েছিল নিজের দেশ ও জাতিকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে সময়টিকে তিনি ব্যবহার করেছেন, 'সেই সময়' বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

'সেই সময়' উপন্যাসটি তৎকালীন ঘটমান জীবনের প্রবহমান চিত্র। ঐতিহাসিক সময়কে খোঁজেন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহকে বিচার করেন কোন বিশেষ জাতির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে। 'সেই সময়'-এর মূল উপজীব্য তৎকালীন সময়ের সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সময়কে জীবন্ত করতে গিয়ে পাশাপাশি নিয়ে চলেছেন কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে। ইতিহাসের চরিত্রগুলির জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যকে বহু গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করে শৈল্পিক নৈপুণ্যে তাঁদের রক্তমাংসের দেহদান করেছেন। কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যেও তিনি যুগজীবন, যুগমানসকে নিয়ে এসেছেন ঐতিহাসিক বাস্তবতায়, চিত্রিত করেছেন শৈল্পিক নিপুণতায়। চরিত্রগুলিকে তিনি এগিয়েছেন সেই সময়ের সমাজ সংস্কারকে মাথায় রেখে। সমাজের সার্বিক প্রবাহের বিশাল পটপরিবর্তনের ধারাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। উনিশ শতকের (১৮০০ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম দশক থেকেই এই যে পরিবর্তনের প্রবাহ শুরু হইয়েছিল, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সেই পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছিল; বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালী মানস পৌঁছেছিল সাবালকত্বের আঙিনায়। উপন্যাসে গৃহীত সময় সেই দীর্ঘ তিন চার দশকের প্রস্তুতির পর বাঙালীর সার্বিক ভাবে জেগে ওঠার সময়, মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলে সুপ্ত

বাঙালীর আত্মসচেতন হওয়ার সময়, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে উত্তরণের সময়।

'সেই সময়' উপন্যাসের মূল কাহিনীবৃত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় নবীন কুমারের জন্মের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির সূচনা ও তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই সুদীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। নবীনকুমারের জীবনের ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক সময়কে অর্থাৎ বাঙালীর নবজাগরণকে ধরার এক বিশাল প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসের পথেই নবীনকুমার আখ্যানের পাশাপাশি এসেছে আরও বহু বৃত্ত। উপন্যাসে অন্যান্য ঘটনা বা চরিত্রকে এনেছেন স্বনামে তাদের ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে, কিন্তু নবীনকুমারের চরিত্রে একটি ঐতিহাসিক সূত্র থাকলেও তার ক্রমবিবর্তন ঔপন্যাসিকের পরিকল্পিত, 'লেখকের কথা' অংশে তিনি জানিয়েছেন, "সময়কে রক্তমাংসে জীবন্ত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়, নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক। তার জন্মকাহিনী থেকে তাঁর জীবনের নানা ঘটনার বৈপরীত্য, শেষদিকে এক অচেনা যুবতীর মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন এবং অদ্ভুত ধরনের মৃত্যু সবই এই প্রতীকের ধারাবাহিকতা, আশা করি আর বিশদভাবে এখানে বলার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় কথা শুধু এই যে নবীনকুমার চরিত্রে এক অকালমৃত ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে। অন্য কোনও প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম আমি বদল করিনি, কিন্তু যাঁকে অবলম্বন করে নবীনকুমারকে আঁকা হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তি চিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এতদিন পরে আর জানবার উপায়ও নেই। সুতরাং দুই চরিত্রের মধ্যে সাজুয্য না খুঁজে নবীনকুমারকে সেই সময়ের প্রতীক হিসাবে গণ্য করাই সঙ্গত হবে। নবীনকুমার চরিত্রে আমি স্বকল্পিত বহু উপাদান সংযোজন করেছি...।"[২] নবীনকুমার প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক এক অকাল মৃত ঐতিহাসিক যুবকের প্রসঙ্গ এনেছেন, কিন্তু কোনো নাম তিনি উল্লেখ করেননি, কিন্তু পাঠক যখন লক্ষ্য করেন

নবীনকুমার ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র প্রতিষ্ঠাতা, মহাভারত অনুবাদক, কথ্য ভাষায় নকশা লেখক, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রের ঐতিহাসিক সূত্র যে এই চরিত্রে আছে তা সহজবোধ্য হয়ে যায়। তাছাড়াও যখন দেখি কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকালকেই উপন্যাসের সময় হিসাবে ব্যবহার করেছেন তখন নবীনকুমারের ঐতিহাসিক সূত্রকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে নবীনকুমার যে কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই কথা জানিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। বলেছেন, “বাংলার রেনেশাঁস-এর অন্যতম প্রতীক চরিত্র হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্যে এবং সমাজ জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই ৩০ বছর হল ১৮৪০-৭০ পর্যন্ত। এ উপন্যাসের নবীনকুমার হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।”[৩]

কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবন মাত্র ত্রিশ বছরের, ১৮৪০ সালের প্রারম্ভে জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম, মাত্র ছয় বছর বয়েসে তিনি পিতৃহীন হন। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৎচরিত্র ও শিক্ষানুরাগের সুনাম ছিল, বালক কালীপ্রসন্ন পিতৃহীন হলে এই হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর অভিভাবকত্ব পান। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তা ছাড়াও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পৃথক ভাবে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ মাত্র তেরো বছর বয়সে। ১৮৫৪ সালে বিবাহ হয় ও কয়েক বছর পর প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হলে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শরৎকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ১৮৫৫ সালে তিনি ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ র সম্পাদক হন, ১৮৫৬ সালে ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’ -এর সূচনা হয় ‘বিক্রমোবর্শী’ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এই বছরেই প্রকাশিত হয় ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ মাসিক পত্র, ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকাও কিছুকালের জন্য তিনি সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ শিক্ষাপ্রসারে, সাহিত্যচর্চায়, পত্রিকা প্রকাশে, দুর্ভিক্ষ নিবারণে,

জনকল্যাণে, বিধবা-বিবাহকারীকে নগদ পুরস্কার প্রদানে ছিলেন অকৃপণ, লঙ সাহেব 'নীলদর্পণ' অনুবাদের অপরাধে শাস্তি পেলে জরিমানার টাকাও শোধ করেছিলেন তিনি। ১৮৬৩ সালে তিনি লাভ করেন 'অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট' ও 'জাস্টিস অব পিস' পদ। ১৮৫৮-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পন্ডিতদের সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ করেন ও বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন। 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), 'বিক্রমোবর্শী নাটক' (১৮৫৫), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬৬) ইত্যাদি তাঁর অমর সৃষ্টি। 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'র অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে অনেক সম্পত্তি হারান। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীসূত্র প্রায় পুরোটাই গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসের সামান্য তথ্যের উপর কল্পনার জাল বুনে উপন্যাসের নবীনকুমার চরিত্রটিকে তিনি রক্তমাংসের রূপ দিয়েছেন। নবীনকুমার চরিত্রে তিনি দেখিয়েছেন সমকালীন নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের টানাপোড়েন ও স্ববিরোধের বাস্তব সত্যকে। নবীনকুমারের আত্ম অনুসন্ধানের পথেই তিনি করেছেন সময়ের সন্ধান, দেখিয়েছেন বাঙালী সমাজের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে। সেই সময়ের সমাজ-মানস নিত্যনতুন পথে পুরোনো নতুনের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে, নিজেকে খুঁজেছে, খুঁজেছে নিজের সার্বিক পরিচয়। নবীনকুমারও প্রতিনিয়ত লড়েছে নিজের সঙ্গে, নিজেকে চিনতে চেয়েছে, নিত্য নতুন পথে খুঁজেছে নিজের সত্তার প্রকৃত স্বরূপকে। নবীনকুমারের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে বাঙালী সমাজ, বাঙালী মানস এবং বাঙালী জীবনও এই আত্ম অনুসন্ধানের পথেই হয়েছে বিবর্তিত। নবীনকুমারে একদিকে পুরোনো বংশগত ঐতিহ্যের মদ্যাসক্তি, বারবধূ বিলাস, নতুন আগত ইংরেজ সমাজ, সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আসক্তি ও অন্ধ অনুকরণ; অন্যদিকে এর থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও নিজ

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা; বিদেশের গুণগত দিকগুলি গ্রহণ করে সুস্থ উন্নত নতুন বাঙালী জাতি গড়ে ওঠার যে নতুন আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল, ঔপন্যাসিক সেই বিশ্বাস, সেই আলোকেই জেগে উঠতে দেখেছেন বাঙালী জাতির মধ্যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এবং সর্বোপরি নবীনকুমারের মধ্যে। উপন্যাসের শেষে এই আলো, নবীনকুমারের "কত আলোকোজ্জ্বল, কত আনন্দময়, অনাগত যুগ"[৪] দেখার স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়েছে কিশোর প্রাণগোপালের মধ্যে।

উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সন্ধান করেছেন বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। খুঁজেছেন সেই শিকড়কে যে শিকড় আজও রসদ জুগিয়ে চলেছে বাঙালী সমাজের প্রবহমানতাকে। বাঙালী সমাজের বিবর্তন, উদ্বর্তনের রূপরেখাকে খুঁজতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের তথ্যকে বানিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের সত্য। উনিশ শতক -কে বহপাঠ ও প্রবল অধ্যাবসায়ের গুণে নিজের মন ও মননে সার্বিক ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলেই উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকেই তিনি পাঠককে প্রবেশ করিয়েছেন 'সেই সময়'এর ভূমিতে। তুলে এনেছেন সেই সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সার্বিক রূপরেখাকে। এনেছেন নব্যবঙ্গের তিন দীক্ষাগুরু রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ও ডেভিড হেয়ার প্রবর্তিত নবচেতনার জোয়ারকে; দেখিয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ডেভিড হেয়ার ও নারী শিক্ষায় বীটন সাহেবের ভূমিকাকে; 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭) ও 'সংস্কৃত কলেজ' (১৮২৪) এর ইতিহাসকে; দেখিয়েছেন ইয়ংবেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার প্রমুখদের প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনাকে; এনেছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর সফলতার ইতিবৃত্ত, ব্রাহ্মসমাজ থেকে ব্রাহ্মধর্মের উত্তরণ এবং দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ভূমিকাকে; এনেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নিয়ে; এনেছেন সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ,

মহারাণীর ভারতগ্রহণ পর্বকে; এনেছেন মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে; হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়কে। ঔপন্যাসিক সেই সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যকে এনেছেন, যে ঘটনাগুলি মধ্যযুগের প্রথা সংস্কার বিশ্বাসকে ঘুচিয়ে, বাঙালীকে জাগিয়ে তুলেছিল, আত্মসচেতন করেছিল, মধ্যযুগীয় নির্মোক কাটিয়ে বাঙালীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়েছিল সেই সমগ্র সত্যকেই তুলে এনেছেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শে বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বিক ভাবে গ্রহণ করার আবেগে মেতেছিল, অন্ধ অনুকরণের নেশায় ভেঙে ফেলেছিল আমাদের সমস্ত ভালোকে, সমস্ত সুন্দরকে। মদ্যপান, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা, ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রবল আসক্তিতে তারা ভেঙে ফেলেছিল আমাদের সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে। কিন্তু শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে বাঙালীও উনিশ শতকের প্রথম কটি দশক পেরিয়ে চিনতে পেরেছিল নিজ সংস্কৃতির স্বরূপকে। খুঁজে পেয়েছিল সেই সত্যকে যে সত্যের ওপর ভর করে বাঙালীর নিজ সত্তার সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।

উপন্যাসে সময়কে ধরতে গিয়ে ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে যেমন রেখেছেন তেমনি বহু কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়েছেন কাল্পনিক বৃত্ত। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ধনী বাবু রামকমল সিংহ মহানদীর বুকে বজরায় পরিভ্রমণে রত রক্ষিতা কমলাসুন্দরীকে নিয়ে। এই সিংহ পরিবারের সূত্রেই উপন্যাসে এসেছে বহু চরিত্র ও ঘটনাবৃত্ত। ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক দুই কাহিনীবৃত্তই যুক্ত হয়েছে এই সিংহ পরিবারের সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে। উপন্যাসে সময় এসেছে ঘটনার প্রধান চরিত্র হিসাবে। ঔপন্যাসিক তুলে ধরতে চেয়েছেন কালের প্রবহমানতার চিত্রকে, যে প্রবহমানতা বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নিয়ে গিয়েছিল নতুনতর পথের দিশায়।

উপন্যাসে নবীনকুমারের জন্ম মুহূর্তে বাবু রামকমল সিংহ ওড়িষ্যার মহাল পরিদর্শনে গেছেন কমলাসুন্দরীকে নিয়ে। সন্তানসম্ভবা বিম্ববতীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দ্রুত কলকাতায় ফিরে তিনি পেয়েছেন পুত্র নবীনকুমারের জন্ম সংবাদ। নবীনকুমারকে ঔপন্যাসিক শৈশব থেকেই গড়ে তুলেছেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় করে। নবীনকুমারের মেধাকে প্রকাশ করতে তিনি বলেছেন, "শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার দর্পণে ছাপাও হয়েছিল এই শিশুর খবর। যুগল সেতু নিবাসী বাবু রামকলম সিংহের বহু সুকৃতির ফলে পরিপক্ক বয়েসে এক পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে।... বালকের বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস মাত্র।"[৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্শম্যান সাহেবের 'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালের ২৩শে মে থেকে। প্রথমে এটি শনিবার করে প্রকাশিত হত, পরে ১৮৩২ থেকে এটি সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৪ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত এটি সাপ্তাহিক আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪২ -এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৪৩ -এর জানুয়ারি অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা মে শনিবার। নবপর্যায় 'সমাচার দর্পন' দেড় বছর চলে চিরতরে লুপ্ত হয়। নবীনকুমারের এক বছর দুই মাসে তার কীর্তি প্রকাশিত হয়েছে 'সমাচার দর্পণ' এ, অর্থাৎ ১৮৪১ সালের কোন একটি সংখ্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

উপন্যাসে বাবু রামকমল সিংহের সাতচল্লিশ বছর বয়সের সন্তান নবীন কুমার। দীর্ঘ যৌবনে তিনি বহু নারীসঙ্গ করলেও কোন নারীই তাকে উপহার দিতে পারেনি একটিও সন্তান। রামকমল সিংহের মনে একটা সচেতনতা ছিল যে তিনি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। নিজ বংশের একটি অনাথ বালককে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দত্তক পুত্র হিসাবে। দত্তক পুত্র গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করেই তিনি উজাড় করেছিলেন তার পিতৃস্নেহ।

যৌবনের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে স্ত্রী বিম্ববতীর সন্তান সম্ভাবনাকেও তিনি ভালো ভাবে নিতে পারেননি। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করতে অপারগ হয়েই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন নবীনকুমারকে নিজ সন্তান বলে, কিন্তু অবিশ্বাসের দোলাচল থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। মৃত্যু শয্যায় তিনি বন্ধু বিধুশেখরের কাছে জানতে চেয়েছেন নবীনের পিতৃপরিচয়, বিধুশেখরের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বিম্ববতীকে অবহেলা করার জন্য তিনি অপরাধবোধেও ভুগেছেন। যদিও নবীনকুমার বিধুশেখরের ঔরস জাত সন্তান। উপন্যাসে সন্তান কামনায় বিম্ববতী বিধুশেখরের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন। ব্রাহ্মণ বিধুশেখর প্রতিষ্ঠিত উকিল, পরিবার ও সম্পত্তি থেকে উদাসীন রামকমল সিংহের পরিবারের সমস্ত দায় তার হাতে। বিচক্ষণ পুরুষ বিধুশেখর একদিকে যেমন নিজের ওকালতি ব্যবসাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি বন্ধু রামকমল সিংহের বিপুল সম্পত্তিও রক্ষা হয়েছে তারই বিচক্ষণতায়।

নবীনকুমারের এই জন্মবৃত্তান্ত সংযোজন উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। নবীনকুমার এই বৃত্তান্ত জানতে পারেনি, এবং এই কারণে তার কোন রকম হৃদয় চাঞ্চল্যও ঘটেনি। ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মবৃত্তান্তকে কালিমালিপ্ত করতে এই আখ্যানকে উপন্যাসে যুক্ত করেননি। আসলে উনিশ শতকের বাঙালী নানারকম সামাজিক আচার সংস্কারের বন্ধনে ছিল সম্পূর্ণ বদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাঁতাকল সমাজকে বেঁধেছিল কঠিন বন্ধনে। কিন্তু সমাজের এই নীতির জালেও ছিল প্রচুর ছিদ্রপথ, যে পথে অপুত্রক নারী পর পুরুষের সংসর্গে সন্তান লাভে সক্ষম হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন বাঙালী সমাজের এই সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা কে, যে সমাজের চরম বিধিনিষেধের ভয়ে বিধুশেখর তার বালবিধবা কন্যা বিন্দুবাসিনীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন, গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতার কারণে তাকে কাশীতে একা ফেলে

চলে আসেন, রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি গঙ্গানারায়ণকে বঞ্চিত পর্যন্ত করেন, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে তাঁর কোন পাপবোধ জাগে না। নিজের ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে তিনি নিজেকে ও বিম্ববতীকে প্রবোধ দেন, ব্রাহ্মণ নিয়োগে কায়স্থের সন্তান উৎপাদন শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত। ঔপন্যাসিক তুলে আনতে চেয়েছেন সেই সময়ের প্রথা, সংস্কারগুলির অন্তঃসার শূন্যতাকে।

'সেই সময়' প্রথম পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে গঙ্গানারায়ণ। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠান এদেশের তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। ১৮২৮ সালে এই কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ডিরোজিও। তিনি যুবকদের মধ্যে প্রবাহিত করলেন নতুন উদ্দীপনা, বাঙালী যুবসমাজে সঞ্চার করলেন নবচেতনার জোয়ার। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দু কলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে তিনি ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু রোপন করে দিলেন যাহা তাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল।"[৬] ডিরোজিওকে কেন্দ্র করেই হিন্দু কলেজের কেরানী উৎপাদনের যন্ত্র কিছু দিনের জন্য মানুষ উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তিনিই প্রথম শিক্ষক যিনি বাঙালী ছাত্রদের মনের কপাট গুলোকে খুলে, তাদের আত্মসচেতন করেছিলেন। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করেও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে। গঙ্গানারায়ণ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন ১৮৪০-৪১ সাল; ডিরোজিও কলেজ ত্যাগ করেছেন ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে। হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমরণ হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রচার হিন্দু কলেজের উন্নতির পথকে রুদ্ধ করতে পারে, কঠোর হাতে তিনি খ্রিস্টান প্রভাব থেকে দূরে রেখেছিলেন

হিন্দু কলেজকে। উপন্যাসে এই ঘটনার সূত্র আছে, "গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী বঙ্কু দত্তকে... চাবুক মেরেছিলেন হেয়ার সাহেব।... সে মীর্জাপুর মিশনে সেন্ডিস সাহেবের কাছে বাইবেল শোনার জন্য যাতায়াত শুরু করেছিল।... মেরে বঙ্কুর পিঠে রক্ত বার করে দেওয়ার পর হেয়ার সাহেব নিজেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন,... ডিরোজিও সাহেব বরখাস্ত হওয়ার পর থেকে হেয়ার সাহেব সাবধান হয়ে গেছেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খ্রীস্টানি প্রভাব ছড়াতে দেখলেই অভিভাবকরা ক্ষেপে উঠবেন আবার। ইতিমধ্যেই কিছু ভালো পরিবারের ছেলে গৌর আঢ্যির ইস্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হচ্ছে।"[৭]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে।

উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে ১৮৪০-৪১ -এর পরবর্তী হিন্দু কলেজ। মধুসূদন দত্ত ১৮৩৭ থেকে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, গৌরদাস বসাক প্রমুখরাও উপন্যাসে এসেছেন গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী হিসাবে। ১৮৪১ সালে মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। উপন্যাসে মধুকে যেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মধু মদ্যাসক্ত, গণিত শিক্ষার প্রতি বিরাগ ভাবাপন্ন হতে শুরু করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' গ্রন্থে বলেছেন, "কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কিনা সন্দেহ।... সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি গণিত চর্চায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।"[৮] উপন্যাসে মধুকে প্রথম দর্শনেই দেখা গেছে মদ্যপ এবং রিজ সাহেবের গণিত ক্লাসে যেতে অনিচ্ছুক হিসাবে। এই সময়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেব। মধুসূদনের জীবনে রিচার্ডসন সাহেবের প্রভাব ছিল অসীম। যোগীন্দ্রনাথ বসু এই বিশিষ্ট

শিক্ষাবিদ সম্বন্ধে লিখেছেন, "১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য করিবার সময় হইতে তিনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।... তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদ ও অর্থগ্রহণ করিতে তাহার ন্যায় সুনিপুণ অধ্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। সে সময়কার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য তিনি 'ব্রিটেনীয় কবিগণের সারসংগ্রহ' 'Selections from the British Poets' নামক যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার গুণগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।... তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল।... ডিরোজিও ছাত্রদিগের বিচার শক্তির উন্নতি সাধনেরই অধিক চেষ্টা করিতেন, আর রিচার্ডসন ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতা ও রসজ্ঞতার পরিবর্ধনের জন্য অধিক প্রয়াস পেতেন।"[৯]

এই রিচার্ডসন সাহেবের ব্যক্তি জীবন তাঁর শিক্ষক জীবনের মত নির্মল ছিল না, নারী ও মদ্যপানে তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল। মধুসূদন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে অপরিসীম প্রশ্রয়ের অধিকারী ছিলেন, দুহাতে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ ও অপরিমিত মদ্যপানে প্রশ্রয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে ছিল। মধুসূদন রিচার্ডসন সাহেবের মতো লেখক হওয়ার বাসনায় তাঁর গুণগুলির সঙ্গে তাঁর দোষগুলিও আয়ত্ব করেছিলেন। উপন্যাসেও মধুকে গৌর দিনের বেলা মদ্যপান নিষেধ করলে সে জানিয়েছে, "বেশ করিচি। কেন খাবো না? রিচার্ডসন মদ খান না? তিনি মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেন না? সেইজন্যই তো তিনি পোয়েট্রি এত ভালোবাসতে পারেন। সেই জন্যই তার কাছে পৃথিবী এত সুন্দর।... গৌর, কবিতা ছাড়া আমার আর কিছুই ভালো লাগেনা।... বায়রণ, বায়রণের সমান, তোরা তখন আমার জীবনী লিখবি"[১০] সময়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন সেই সময়কে যেখানে নব্য শিক্ষিত যুবক সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রথম যৌবনে সভ্য ইংরেজ জাতির সমকক্ষ হতে নিজের বাবা মায়ের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেননি। হিন্দু সমাজের নিয়ম অনুযায়ী একটি অশিক্ষিত বালিকাকে বিবাহ করতেও রাজী হননি। মহান কবি পোপের বাণী উদ্ধৃত করে বন্ধুদের জানিয়েছেন, "টু ফলো পোয়েট্রি, ওয়ান মাস্ট লিভ বোথ ফাদার অ্যান্ড মাদার।"[১১] গঙ্গানারায়ণ মদ ছুঁতে, গরুর মাংস খেতে অস্বীকার করায় মধু বলেছেন, "এই জন্যই তোদের কিচ্ছু হবে না! তোদের হিন্দু ধর্মের ওপর এই জন্য আমার ঘেন্না ধরে যায়। বিফ অ্যান্ড ওয়াইন স্ট্রং পিপলদের সব সময় দরকার। দ্যাক ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, যবন সবাই গোমাংস খায়, সবাই ড্রিঙ্ক করে... এই জন্যই দে আর মাইটি, দে আর কঙ্করার্স, ওরা ভালো কবিতাও লেখে! শুধু হিন্দুরাই মিনমিনে, নিরামিষ খায় আর নেড়ামুণ্ডি হয়ে বসে থাকে, সেই জন্যই অন্য জাত যখন তখন হিন্দুদের গালে থাপ্পড় মেরে যায়।"[১২] শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের প্রতিই তাঁর বিরাগ ছিল এমন নয়, বাংলা ভাষাকেও তিনি প্রথম জীবনে চাকর-বাকরদের ল্যাঙ্গোয়েজ বলে মনে করেছিলেন। উপন্যাসে মধুকে বলতে শোনা গেছে, সংস্কৃতে বামুন বামুন গন্ধ আর বাঙলায় চাকর-বাকরের গন্ধ। হেয়ার সাহেব বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করলেও মধু মানেননি, নমস্য হেয়ারের উদ্দেশ্যেও ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করেছেন। নিজের বাঙালীত্বকে ঝেড়ে ফেলতে মধু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী। তাঁর মনে হয়েছিল রাজধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়েই তিনি রাজার জাতিতে উঠতে পারবেন। ইংরেজ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাই হয়ত তাঁর মনে নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন রকম শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে পারেনি; ইংরেজ জাতিকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করে তার ভালো-মন্দ সবটাকেই আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। উপন্যাসে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংবাদ পাওয়া গেছে গঙ্গানারায়ণের বিবাহ বাসরে। গঙ্গানারায়ণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিধুশেখরের আদেশে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে, কিন্তু মধুসূদন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে না করতেই ত্যাগ

করেছেন নিজের ধর্ম ও পিতামাতাকে। গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছে এখানেই মধুর জয়। সে নিজে কিছুতেই পারলো না, বিবাহে তার তীব্র অসম্মতি ছিল তবু মেনে নিতে হল তাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র পুলক অনুভব করেনি, বরং বিরক্ত স্তুপীকৃত হয়েছে। নববধূর দিকে তার পূর্ণদৃষ্টি মেলে চাইতেও ইচ্ছে করেনি।

মধুসূদন যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের পথে চলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি পোষাক পরিচ্ছদ বা আচার-বিচারে ইংরেজকে গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মুক্ত মন ও মুক্ত চিন্তাকে, গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্যের কর্মক্ষমতাকে। কোনও সংকীর্ণ ধারণার বশে তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে যেমন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেননি তেমনি যা কিছু প্রাচ্য তাকেই ত্যাগ করে সভ্য হবার প্রচেষ্টায় মাতেননি। একদিকে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে তিনি বিদেশি কালি ও কলম কিনে এনেছেন, অপর দিকে তিনি সর্বসাধারণের পাঠ্য বাংলা গদ্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। বাংলা লেখালেখিতে কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে তিনি বাংলা গদ্যকে সাবলীল করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তৎকালীন বাঙালী সমাজ বাংলা ভাষাকে সাহিত্যপদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করেনি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সহজবোধ্য ভাষায় রচিত ‘বাসুদেব চরিত’ শোনালে মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের মতো একজন বিদগ্ধ মানুষের কাছ থেকে এমন মেয়েলি ভাষা আশা করেননি বলে জানান, তাঁর মত বাংলা ভাষায় সাহিত্য হয় না। বন্ধুর এই ধারণা ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রবল আঘাত দিয়েছিল।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে নব্য শিক্ষিত যুবসমাজ নতুন সভ্যতার স্পর্শে আলোড়িত হয়েছে, বেজে উঠেছে নবজাগরণের দামামা, সেই সময়ে কিন্তু এদেশের আপামর জনসাধারণ থেকেছে এই নতুন স্রোতের থেকে অনেক দূরে। তাদের মধ্যে প্রবাহিত

হয়েছে পুরোনো প্রথা, সংস্কার, ঐতিহ্যের ঢেউ। দেশের পরিবার, বিবাহপ্রথা, নারীমহলও ছিল এই নতুন স্রোতের থেকে বহুদূরে। আসলে বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির গায়ে লেগে থাকা এই চিরায়ত সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি নারীরা, আর পর্দানশীন বাঙালী নারী দীর্ঘলালিত গৃহজীবনে বজায় রেখে এসেছিল সংসারের সমস্ত নিয়ম নীতি ও ঐতিহ্য। উপন্যাসে যে সময়ে একদিকে বাঙালী সমাজের পরিবর্তনের ঢেউকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক, অন্যদিকে নিয়ে এসেছেন সমস্ত প্রথা, সংস্কারের জাঁতাকলে পিষ্ট নারীজাতির অসহায় ক্রন্দনকে।

উপন্যাসে বিধুশেখরের পরিবারকে ঔপন্যাসিক করে তুলেছেন বৈদিক কুলীন। উপন্যাসের পংক্তি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়, "বৈদিক কুলীন বলে ঐ পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হয় কুলসম্বন্ধ করে। কন্যাসন্তান জন্মাবার দু-এক মাসের মধ্যেই স্বজাতের মধ্যে কোনো পাত্র নির্বাচন করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতে হয়। তারপর যথা সময়ে সেই নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ।"[১৩] বিধুশেখরের তৃতীয় কন্যা বিন্দুবাসিনীর ছেলেবেলায় যে ছেলের সঙ্গে 'কুলসম্বন্ধ' ঠিক করে রাখা ছিল, বয়স সাত না পার হতেই ছেলেটি মারা যায়। ফলে বিন্দুবাসিনী 'অন্যপূর্বা' হয়ে যায়। কোন কুলীন ঘরে আর তার বিবাহ সম্ভব না হলে এক মৌলিক ঘরের পাত্র স্থির হল তার জন্য। কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাকে বিধবা হয়ে ফিরে আসতে হল মাত্র সাড়ে নয় বছর বয়সে। মাত্র সাড়ে নয় বছরের বালিকার ঠাকুর ঘরে মন বসেনি, দুবেলা নমো নমো করে কোনোমতে পুজো সেরে সে পড়াশুনাতে মন দিয়েছিল। শিবরাম আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীরামপুর মিশনে চাকরি করতেন; সপ্তাহে দুদিন বিধুশেখরের বাড়িতে থেকে তিনি বিন্দু ও গঙ্গাকে সংস্কৃত শেখাতেন। একদিন বিধুশেখরের নির্দেশে তিনি আর বিন্দুকে পড়াতে চাইলেন না, বললেন, "যাহা শিখিয়াছ তাহা যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে যতখানি শিক্ষা করা উচিত, তুমি তাহা অপেক্ষা

বেশিই পড়িয়াছ।... স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহা লোকাচার সম্মত নহে। বিন্দু যাহা শিখিয়াছে, তাহাতেই সে ধর্মগ্রন্থাদি যথেষ্ট পড়িতে পারিবে।... তোমার পিতামহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, কন্যার পাঠ যথেষ্ট হইল। আর অধিক কী! সে এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া হইয়াছে।"[১৪] বালবিধবা বিন্দু নয় বছর বয়স থেকে শুধু লেখাপড়াকে আশ্রয় করেই বেঁচেছে। আকস্মিক আঘাতে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন তছনছ হয়ে গেছে। শিবরাম আচার্য আর গঙ্গানারায়ণকে পড়াতে চাননি, তিনি বলেছেন, "তুমি হিন্দু কলেজে পড়িতেছ, তোমার চিন্তা কী! সংস্কৃতের যুগ ফুরাইয়াছে। আমি আর কিছুদিন থাকিলে তোমার নিকট হইতে দুইচারি ইংরাজি শব্দ শিক্ষা করিতাম।"[১৫] গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনে শিক্ষক শিবরাম আচার্যের অভাব খুব বেশি অনুভব করেনি, কিন্তু বিন্দুর জীবন হারিয়ে গেছে নিঃসীম শূন্যতায়। এই বালিকার গায়ে এসে লাগল না সাগরপারের দেশ থেকে আগত নতুন সভ্যতার ঢেউ। দীর্ঘ বৈধব্যের একাকীত্বের জীবনে তার থাকল না আঁকড়ে ধরার মত আশ্রয়। হেয়ার সাহেবরা যখন নারী শিক্ষার প্রসারের কথা ভাবছেন, তখন গঙ্গানারায়ণের মনে হয়েছে বিন্দুর কথা, কিন্তু বিধবাদের শিক্ষাদানের কথা তখন অলীক কল্পনাতেও ভাবা যেত না। উপন্যাসে হেয়ার সাহেব গঙ্গানারায়ণকে বলেছেন, "প্রিয় বৎস, দেখিয়া লইয়ো, ক্রমে ক্রমে বিধবা বালারাও বিদ্যালয়ে আসিবে। যদি আমি আর দশ বৎসর বাঁচি, তবে সকল শ্রেণীর বালিকাদের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যাব। এই আমার শেষ ইচ্ছা"[১৬] গঙ্গানারায়ণের শরীর রোমাঞ্চিত হলেও সে বুঝেছে বিন্দুর জীবনে পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়। আর দশ বছর পরে বিন্দুর আর স্কুলে যাবার বয়স থাকবে না। হেয়ার সাহেবের এই ইচ্ছা পূরণ হয় না। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে জানা যায়

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪২ সালে কলকাতায় কলেরা আক্রান্ত হয়ে।

ঔপন্যাসিক 'সময়'কে সন্ধান করতে গিয়ে তুলে এনেছেন সেই যুগের সমস্ত ইতিবৃত্তকে। রাইমোহন, গুপী স্যাকরার বৃত্তের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে এনেছেন সময়ের সমস্ত অন্তঃসারশূণ্যতা, সমস্ত ভন্ডামির স্বরূপকে। এনেছেন সেই সমস্ত মানুষদের, যাদের বাইরে ভদ্রতার মুখোশ থাকলেও ভেতরে বহমান ছিল প্রবল নারী লোলুপতা। ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ প্রবাহ পথে, পুরুষের কাছে নারী ছিল ভোগের বস্তু। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও প্রগতিশীলতার পথে এগোনো সমাজ সার্বিক ভাবে বেরিয়ে আসতে পারেনি এই দীর্ঘলালিত ভাবনাকে ভেঙে। তৎকালীন কলকাতার প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এনেছেন পূর্ববঙ্গের বাবু পূর্ণচন্দ্রের ইতিবৃত্তকে। মদ এবং মেয়েমানুষের জোয়ারে কীভাবে সে সময়ের উচ্চবিত্ত মানুষেরা নিজেদের সর্বস্ব হারাত তার চিত্রও এঁকেছেন। উপন্যাসে রামকমল সিংহ সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু তিনি গণিকা কমলাসুন্দরীর সঙ্গে সম্পর্কে কোনভাবেই লজ্জিত নন। গুপী স্যাকরার মত মানুষেরা নিজেদের সমাজে উঁচু স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে ভাড়া করা রমণী রাখেন। জগমোহন সরকারের মত মানুষ যিনি সমাজে গণ্যমান্য, মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা যার ব্রত, তিনিও রাতের অন্ধকারে চুপিসারে বারবণিতাদের কাছে যান। বাঙালীর নবজাগরণের স্বরূপকে যাচাই করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, এক পা এগিয়ে আবার দশ পা পেছনোর মধ্যদিয়েই তৈরী হয়েছিল বাঙালীর বিবর্তনের পথ, বা নবজাগরণের প্রভাতে প্রকৃত অর্থে জেগে ওঠার পথ।

সিংহ পরিবারের ভৃত্যমহলের চিত্রতেও উঠে এসেছে সেই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ। কলকাতা শহরে একদিকে যখন নতুন প্রভাতের সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন অন্যদিকে এই পরিবারের ভৃত্যমহলে গেঁথে বসেছিল আদিম প্রবৃত্তির সর্পিল আবহ। সোহাগবালার রাজত্বে পুরুষের ভোগের সামগ্রী

নারী। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভোগ করে পুরুষেরা; কিন্তু নারীরা যদি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে তাহলে সমস্ত দায় এড়িয়ে যায় পুরুষেরা অনায়াসে। পুরুষের কোন অত্যাচারের প্রতিবাদ নারীরা করতে পারে না। থাকোমণির মত গ্রামের মেয়েরা এই ভৃত্যমহলে এসে কিছুদিন নিজের সতীত্ব বজায় রাখলেও একদিন নিজের সতীত্বকে বর্জন করে তাদের ব্যক্তিত্ব বা নারীত্ব অর্জন করতে হয়। সোহাগবালা নিজের স্বামীকে বেঁধে রাখতে প্রতিদিন নিত্যনতুন দাসীকে জুগিয়ে চলে। পুরুষ মানুষের ভোগ লালসা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তা নিয়ে কোনরকম লজ্জাবোধ প্রশ্নাতীত। সমাজের নৈতিক চরিত্রের এহেন দুর্দশার দিনেই নারীর অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মত প্রগতিশীল মানুষেরা, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে নতুন সকালের নতুন সূর্যোদয়ের পথ হয়েছিল প্রশস্ত।

উনিশ শতকের বাংলাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এনেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে(১৯৭৪-১৮৪৬)। সেই সূত্রে তুলে ধরেছেন ঠাকুর পরিবারের সমস্ত প্রাচীন সূত্রকেও। দ্বারকানাথ প্রথম বাঙালী যিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। দ্বারকানাথের যৌবনে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়নি। জোড়াসাঁকোতেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেছিলেন। আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হলেই তিনি স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। পালক পিতার কাছ থেকে জমিদারি সম্পত্তি পেলেও তিনি বুঝলেন আসলে বাণিজ্যতেই লক্ষ্মীর আনাগোনা। ব্যাংকিং, ইন্সওরেন্স, রেশম, নীল, কয়লা এবং জাহাজ চলাচল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসাতেই তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। 'কার টেগোর কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠার পর মহামান্য বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন। সেই সময় রুস্তমজী কাওয়াসজী নামে অপর এক ভারতীয় জাহাজের ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রামমোহন রায় ও তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজরা শাসক এবং রাজার জাত, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ইংল্যান্ডে একটি ছোট শ্রেণী মাত্র, একটা প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্মচারি। এমন অনেক ইংরেজ আছে যারা মুক্তমনা, উদার, একতরফা শোষণের প্রতিবাদকারী। তারা এ দেশের ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখায়, সংবাদপত্রে সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন এই শ্রেণির ইংরেজদের সাহায্য ছাড়া ভারতবাসী নিজেদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে না। দ্বারকানাথ ইংল্যান্ড যাবার সময় এদেশ থেকে নানা উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে ভারতীয়দের জন্য নিয়ে এলেন একজন মানুষ, নাম টমসন। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু দ্বারকানাথ বেশিদিন এই দেশে থাকলেন না। নিজের অর্জিত ধন ভোগ করার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলেন, সেখানে তিনি প্রবল সম্মান ও প্রতিপত্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন, নেটিভ হয়ে যে সম্মান ও আদর তিনি ইংল্যান্ডে পেয়েছিলেন তা বিরল দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে দ্বারকানাথ যেভাবে সাহেবদের নানা বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, শিল্পে, বাণিজ্যে ব্যবহার করা নানা অভিনব পন্থাগুলিকে এদেশের উন্নতিকল্পে ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করতেন পরবর্তীকালে তিনি সেই সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন। এদেশের প্রতি তাঁর আগ্রহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ না প্রকাশ করায় তিনি আরও মর্মাহত হলেন; প্রচুর অর্থ নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের পথে। ইউরোপের উচ্চবিত্ত মহলের সঙ্গে মিশে তিনি প্রচুর সম্মান ও আধিপত্যের সঙ্গে কাটালেন শেষ জীবন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি বিদেশিদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি, রুচি, আচার ব্যবহারের নজির।

দ্বারকানাথের এই ভোগবিলাসের ঐতিহ্যকে বহমান রাখেননি তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অত্যন্ত কম বয়স থেকেই তিনি চলে গিয়েছিলেন অধ্যাত্মমার্গের দিকে। উপনিষদের শ্লোক - ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। / তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধং।। - তাঁর হাতে এসে পড়ল। এই শ্লোকের ভাবনা, ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগতকে আচ্ছাদন কর, তিনি যাহা দান করেছেন তাই উপভোগ করো, তাঁকে স্তম্ভিত করল। তিনি প্রথম বয়েসে দেবমূর্তি ও শালগ্রামশিলাকেই দেবতা বলে গণ্য করতেন, ভয় ও ভক্তিতে তাদের প্রণাম করতেন। ক্রমাগত তিনি বুঝতে পারেন এই কাঠ বা পাথরের মূর্তি ঈশ্বর হতে পারে না। তিনি খুঁজতে শুরু করেন ঈশ্বরের স্বরূপ। সংসারের সমস্ত কিছু থেকে তাঁর মন সরে যেতে শুরু করে। সহপাঠীদের মতো তিনি লক হিউমের দর্শনে আস্থা রাখতে পারলেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ণ করেও যখন তিনি তৃপ্ত হলেন না, তখন পেলেন এই উপনিষদের শ্লোক। স্তম্ভিত হয়ে তিনি ভাবলেন, এর থেকে বেশী মানুষের কী চাওয়ার থাকতে পারে, তাঁর মনে পড়ে গেল সেই দিনটির কথা, যেদিন বিলাত যাত্রার কিছুক্ষণ আগে রামমোহন এসেছিলেন দ্বারকানাথের কাছে বিদায় নিতে। সেই সময়ে তিনি দেবেন্দ্রকে ডেকে তার হাত চেপে ধরেছিলেন। দেবেন্দ্রের মনে হল, হয়ত সেই দিন রামমোহন রায় তাঁকে নিজের কার্যভার সঁপে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুরমাও মৃত্যুর সময় ঈশ্বর ও পরকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা শোনার পরে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে এতদিন যিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যিনি, সেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিজের গুরু হিসাবে বরণ করলেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করলেন ‘তত্ত্বরঞ্জিনী সভা’। দুই বছর পরে এই সভার নাম হল ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। দেবেন্দ্র বিষয় রক্ষার বদলে এই ব্রহ্ম উপাসনায় মাতলে দ্বারকানাথ ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র কোন বাধাই মানলেন না। তিনি বুঝলেন তাঁর পিতার মত পার্থিব জগতে সকলের ঊর্ধ্বে যাওয়াই

জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ তাঁর কুড়িজন বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মসমাজ রূপ নিল ব্রাহ্মধর্মের। তিনি চাইলেন শিক্ষিত হিন্দু যুবসমাজ যেভাবে হিন্দুধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, শিক্ষিত মানুষের জন্য প্রয়োজন এই নতুন ধর্মের প্রবর্তন। ইংল্যান্ডে পিতার মৃত্যুর পরও দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত হিন্দু নিয়মে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন না। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের জন্য গড়ে তুললেন নতুন ধর্ম যেখানে চিরায়ত হিন্দু ধর্মের সমস্ত সংস্কারকে বাদ দিয়ে গড়ে তোলা হল একটা নব্য হিন্দু ধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্ম। বাঙালী এগোলো আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর মনে করেছিলেন, বর্বর হিন্দুধর্ম ছেড়ে সুসভ্য খ্রিস্টানদের তিনি সমকক্ষ হয়েছেন। তাই পিতা রাজনারায়ণ দত্তের শত চেষ্টা বা মায়ের শত অশ্রু তাঁকে ফেরাতে পারেনি। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁর আর হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না। প্রথমদিকে তিনি বহু পাদ্রীদের বাড়িতে থেকে তাদের থেকে পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে তারাই তাঁকে বিশপস কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই কলেজে আবাসিক ছাত্র হতে গেলে মাসে ষাট টাকা করে লাগে। রাজনারায়ণ বসু মধুকে এত কিছুর পরেও পাদ্রীদের ভিক্ষাজীবী হতে দিতে চাননি। তিনি স্ত্রীর হাত দিয়ে মধুর জন্য মাসিক একশ টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। বিশপস কলেজে সেই সময়ের ছাত্র ছিল খাঁটি ইউরোপীয়ানরা ও কিছু দেশীয় খ্রিস্টান, এদের মধ্যে মধুই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্র। কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দিনেই তিনি দেখলেন দেশীয় এবং ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য দুরকম পোষাক। মধু এর বিরোধিতা করায় তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ানদের মত ‘ক্যাসক’

পরার। নানা জায়গায় তিনি প্রতিদিন অনুভব করতে পারলেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও পুরোপুরি ইউরোপীয় হওয়া যায় না। শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হতেই তিনি সগর্বে পদদলিত করেছিলেন নিজের ধর্ম, ভাষা ও সমাজকে। বাঙালীত্বের খোলস ত্যাগ করে ইউরোপীয় হতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন খোলস ত্যাগ করলেই পরিচয় বদলে ফেলা যায় না, নিজ সত্তাকে পরিবর্তিত করে ফেলা যায় না, কিন্তু নিজের পরিবর্তিত সত্তাকেও তিনি ঝেড়ে ফেলতেও চাননি।

উপন্যাসে মধুসূদন যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবি, হেনরিয়েটার সঙ্গে দাম্পত্য সুখে যখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন, সে সময়ে একদিন পথ দিয়ে চলছিল মহরমের সাড়ম্বর বর্ণাঢ্য মিছিল, শিশুকন্যা শর্মিষ্ঠা ও হেনরিয়েটাকে শোনাচ্ছিলেন হাসান-হোসেনের বিষাদ কাহিনী। সেই কাহিনী শোনাতে গিয়ে তিনি হেনরিয়েটাকে বললেন, "জানো আরিয়েৎ, মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে কাব্য রচনা করে, তা হলে সে মহাকবির স্বীকৃতি পাবে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে সে সমগ্র মুসলমান জাতির মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের ধর্মে এমন তীব্র শোকের বিষয়বস্তু নেই।"[১৭] মধুসূদন হিন্দুধর্মের কথা বলতে গিয়ে বললেন 'আমাদের ধর্মে'। এই অসঙ্গতি আরিয়েৎ ধরিয়ে দিলে তিনি বলেছেন, "মুখের কতায় ওরকম এসে যায়! হোয়াট আই মেন্ট, হিন্দুদের ধর্মে! ব্রজঙ্গনা লেখার পর অনেকে আমাকে বোষ্টম বলতে শুরু করেছে! কিন্তু আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান।"[১৮] ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে জাতি, বা যে ধর্মের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ত্যাগ করে তিনি রূপান্তরিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাড়ীর যোগ তিনি ছিন্ন করতে পারেননি, নিজের শেকড়কে করতে পারেননি অগ্রাহ্য।

১৮৪১ সালে মাত্র একুশ বছর বয়েসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যোগ দিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। পাঁচ বছর পরে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার হঠাৎ পরলোক গমন করায় সংস্কৃত কলেজে

সেক্রেটারির পদ খালি হলে, সাহেবরা বুঝেছিলেন আর কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত বা টুলো বামুন দিয়ে কলেজ চালানো যাবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের নাম প্রথমেই উঠে এসেছিল। দুই কলেজেই বেতন পঞ্চাশ টাকা কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁকে পড়াতে হয় বিদেশি সিভিলিয়ান দের, তারা সংস্কৃত শেখে চাকরি রক্ষার জন্য। সংস্কৃত কলেজ প্রকৃত অর্থে জ্ঞানচর্চার স্থান। বিদ্যাসাগর যোগ দিলেন সংস্কৃত কলেজে। এই কলেজে যোগ দিয়েই তিনি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেন। সপ্তাহে একদিন রবিবার তিনি ছুটির দিন নির্দিষ্ট করলেন। শিক্ষকদের ক্লাসে ঘুমানো, অকারণে দেরি করে আসা ইত্যাদি কঠোর হাতে বন্ধ করলেন। না জানিয়ে কোন ছাত্র বা শিক্ষক দিনের পর দিন কলেজ বাদ দিতে পারবে না এমন নিয়ম চালু হল। তাঁর সৎ প্রচেষ্টা সেক্রেটারি রসময় দত্ত ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। কলেজটিকে আমূলভাবে ঢেলে সাজানোর একটা পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রসময় দত্ত কিছুতেই সেই পরিকল্পনাটি সাহেবদের কাছে পাঠাতে রাজী হলেন না। বিরক্ত হয়ে মাত্র একবছর তিন মাসের মধ্যে ইস্তফা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

এই সময় থেকেই বাঙালী সমাজের নানা নিয়ম নীতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। তাঁর বাল্য শিক্ষক যাঁকে তিনি চরম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন সেই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভগ্নকুলীন। বহুবিবাহতে তাই তার আলস্য নেই। ঈশ্বরচন্দ্র খুব অবাক হয়েছিলেন এই দেখে বৃদ্ধ বয়েসে শুধুমাত্র টাকার জন্য তিনি একটা বালিকাকে বিয়ে করতে চলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু হলে একটা অসহায় নিরপরাধ বালিকা বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করবে চিরকাল। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধকে নিবৃত্ত করা যায় নি। ঈশ্বরচন্দ্র ভেবেছেন যাঁরা নমস্য, যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরাও এই প্রকার অন্যায় করে, তবে সাধারণ অশিক্ষিত কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তো এমন

করবেই। অথচ এর প্রতিবিধান করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। যে সময়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে পুরুষের বহুবিবাহ, নারীদের বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হতে শুরু করেছিল ঠিক একই সময় থেকে বাংলার নব্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও এই ভাবনার প্রবাহ ঘটেছিল।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গঙ্গানারায়ণ কৈশোরে পা রাখতেই তার বাল্যসঙ্গী বিন্দুবাসিনীকে বন্দী করে দেওয়া হল ঘরের চার দেওয়ালে। বালবিধবা বিন্দুর সামনে পড়ে থাকল দীর্ঘ একাকীত্বের যন্ত্রণাময় জীবন। বয়স অল্প হলেও গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীর এই বেদনাকে বুঝতে পেরেছিলেন, সেই কারণেই হেয়ার সাহেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিধবাদের শিক্ষাদানের বিষয়ে। বিধুশেখরের নির্দেশে নিজের অমতেই গঙ্গাকে বিবাহ করতে হয়েছিল বাগবাজারের অষ্টমবর্ষীয়া লীলাবতীকে। কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণ অনুভব করেছেন, বিন্দুবাসিনীর প্রতি তার মনে জেগে উঠেছে প্রবল প্রেমবোধ। অপরদিকে বালবিধবা বিন্দুবাসিনীও তার বাল্যসখা গঙ্গার প্রতি খুব স্বাভাবিক নিয়মেই অনুরক্ত। তাদের দুই পরিবার পারিবারিক বন্ধু হলেও বিধুশেখররা ব্রাহ্মণ তাই এই দুই বালক বালিকার বিবাহ দিয়ে নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনে বেঁধে ফেলার চিন্তা দুই পরিবারের মনে ঠাঁই পায়নি কোনোদিনই। দুটি মন নিজেদের অজান্তেই একে অপরকে গ্রহণ করে ফেলেছে। বিন্দু নিজে মনকে প্রকাশ করতে চায়নি, কিন্তু গঙ্গা বিন্দুর কাছে নিজেকে গোপন করেনি, বিন্দুকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে অন্যকোন দূর দেশে যেখানে তাদের কেউ চিনতে পারবে না। বিন্দু পারেনি, চিরায়ত সংস্কারকে মেনে বিধবার ভালোবাসাকে পাপ হিসাবে দেখেছে, ভেবেছে সমাজের থেকে পালালেও নিজের মনের থেকে সে পালাতে পারবেনা। নিজের ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে সে গঙ্গাকে পরজন্মে পেতে চেয়েছে, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সে গঙ্গাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। গঙ্গা কিছুতেই পারেনি বিন্দুকে ছেড়ে থাকতে। আগুনের দিকে পতঙ্গ যেমন মৃত্যু অনিবার্য

জেনেও আকৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনই গঙ্গাও সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের কথা জেনেও ছুটে গেছে বারে বারে বিন্দুর কাছে, একদিন বাড়ির সকলের কাছে তাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, বিধুশেখর আর কিছু না ভেবে একা বিন্দুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাশীতে। গঙ্গা কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারেনি বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কোন রমণী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিন্দু তার জীবনে শুধু নারীর প্রয়োজন মেটাবে না, বিন্দু তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত যুবসমাজ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে নারীকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে নয়, পেতে হবে কর্মসঙ্গিনী হিসাবে। তাদের মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেছে প্রথাগত ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণ বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করলেও দেখেছে অশিক্ষিত একটি নারী শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে কিন্তু জীবনসঙ্গিনী নয়। সাংসারিক জীবনে আর স্থিত হতে পারেননি গঙ্গানারায়ণ। মায়ের সম্পত্তি পরিদর্শনে ইব্রাহিমপুর গেলে সেখানে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপ দেখে আহত হয়েছে, ইব্রাহিমপুরে তাদের প্রজাদের উপরে নীলকর সাহেব ম্যাকগ্রেগরের অত্যাচার বেড়েই চলেছে, গঙ্গানারায়ণ সেখানে পৌঁছে জড়িয়ে পড়েছে গরিব প্রজাদের দুঃখ দুঃর্দশার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর ছন্নছাড়া মন তখনই পারেনি এদের রক্ষা করতে। রাতের অন্ধকারে একটা ঘোরের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ যাত্রা করেছে নিরুদ্দেশের পথে, একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সে পৌঁছে গেছে বারাণসীতে। সেখানে গিয়ে নিজের মানসিক ক্লৈব থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা খুঁজতে শুরু করেছে বিন্দুকে। বহু খোঁজার পর সে জানতে পেরেছে, বিন্দুকে দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেছে এবং তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে বিন্দুর মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের ভয়াবহ বাস্তব সত্যকে, যেখানে একদিকে বালবিধবাকে অকলঙ্ক রাখতে তাকে বারাণসীতে প্রবাসে পাঠানো হয়, কিন্তু সেই মেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে

পড়ে পতিত হয় নরকে, শারীরিক মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রণায় তার দেহ মন হয় প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত। অন্যদিকে পিতা তার নিষ্কলঙ্ক মৃত্যু সংবাদে নিজের কুলমর্যাদা রক্ষার শান্তি পায়। বিধুশেখরের পরিবার পতিত হবে এই ভয়ে যে শেঠজী বিন্দুর দেখভাল করতেন তিনি বিধুশেখরকে প্রকৃত সংবাদ জানাননি, আবার বিধবা মেয়ে সমস্ত কলঙ্কের ভয় ঘুচিয়ে মারা গেছে এই স্বস্তির সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টাও বিধুশেখর করেননি। গঙ্গানারায়ণ কাশীতে গিয়ে জানতে পেরেছেন বিন্দুর মৃত্যু সংবাদ, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি, বিন্দুকে খুঁজে বেড়িয়েছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। এরপর একদিন খোঁজ পেয়েছে বিন্দুর, জানতে পেরেছে তাকে দস্যুরা লুন্ঠন করে নিয়ে গেছে, চরম আঘাতে তার মন ভেঙে জর্জরিত হয়ে গেছে। দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে বিন্দুর কাছে পৌঁছে তিনি শুনেছেন বিন্দু মা হয়েছিল এবং তার ছেলেকেও ওরা কেড়ে নিয়েছে। সমাজের নিষ্ঠুর কষাঘাতে একটি নিষ্পাপ বালিকা পরিণত হয়েছে কাশীর রেন্ডিতে। যে মেয়েটি একসময় পড়াশোনার মধ্যে ডুবিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, সেই মেয়েটির শরীর-মন ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে একদল দেহ পিপাসী নোংরা মানুষ। গঙ্গানারায়ণ নিজের মনের সবটুকু উজাড় করে ভালোবেসেছিল বিন্দুকে, তাকে কেন্দ্র করে নিজের জগৎ পূর্ণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি বিন্দুকে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের ভয়াবহ বাস্তব সত্যকে, যেখানে বালবিধবাকে অকলঙ্ক রাখতে বারাণসীতে প্রবাসে পাঠানো হয়, সেই মেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে পতিত হয় নরকে, শারীরিক মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রণায় তার দেহ মন হয় প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত। অন্যদিকে পিতা তার নিষ্কলঙ্ক মৃত্যু সংবাদে নিজের কুলমর্যাদা রক্ষার শান্তি পায়।

উপন্যাসে নব্যচেতনায় জেগে ওঠা যুবকের জীবন ভেঙে গেছে প্রথা সংস্কারের জাঁতাকলে। পিতা রামকমল সিংহের মৃত্যুর পরে বিধুশেখর বিন্দুকে ভালোবাসার শাস্তি স্বরূপ রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে

বঞ্চিত করলেন গঙ্গানারায়ণকে। নিজ ঔরসজাত পুত্র নবীনকুমারকে রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তির অংশীদার করে দিলেন। বিধুশেখর সেই ব্যক্তি যিনি বন্ধুপত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছেন, মৃত্যু শয্যায় বন্ধুকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন, সেই মানুষটিই গঙ্গানারায়ণের প্রতি নিজের সমস্ত স্নেহ তুলে নিলেন বিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইছেন তৎকালীন সমাজের এই পরস্পর বিরোধের সত্যকে। নিজ বালবিধবা কন্যা বিন্দু ও কিশোর গঙ্গার নিষ্পাপ ভালোবাসা তার কাছে পাপ, কিন্তু বিম্ববতীকে তিনি জানিয়েছেন, "সন্তানহীনা বলে তোমার মনে দুঃখ ছেল, সেই দুঃখ জুড়োবার জন্য আমি তোমায় একটি পুত্র সন্তান দিয়েছি। ...আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ, বিবাহিতা রমণীর ব্রাহ্মণ নিয়োগে সন্তান উৎপাদন দেশাচারসম্মত। তাই তোমায় বলচি, কোনো পাপ হয়নি মনে পাপ রেকো না...।"[১৯] গঙ্গানারায়ণের মনকে তিনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চেয়েছেন, বিন্দুবাসিনীকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেননি, তার মনে হয়েছে অপরাধের তুলনায় তিনি তো বিন্দুকে অতি মৃদু শাস্তিই দিয়েছেন। মতিচ্ছন্ন হয়ে সেই মেয়ে এই ঠাকুরঘর অপবিত্র করেছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাপ মনে দেখেছিল। পাপ মনে তাকে স্পর্শ করতে এসেছিল, তার আগে বিন্দু বিষ পান করেনি কেন? বিন্দু তেমন ভাবে মরলে কন্যার জন্য গর্বিত হতেন বিধুশেখর, কন্যার নামে কালীঘাটে একটি পাথর বাঁধিয়ে দিতেন। সংযমই বিধবার তো অলংকার। যে বিধবা এ জন্মে প্রতিটি বিধান মেনে কঠোরভাবে আত্মসংযম পালন করে, পরজন্মে তার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হয়। একথা তিনি কতবার বুঝিয়েছেন বিন্দুকে। তা সে শুনল না, জীবনে তিনি তার মুখদর্শন করবেন না। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের এমন সব সত্যকে যেগুলি সেই সময়কে সার্বিকভাবে চিনিয়ে দেয়। বিধুশেখরের কারণে যখন গঙ্গানারায়ণকে বিন্দুকে হারাতে হয়, রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তখন মা বিম্ববতীর মন রক্ষার্থে তাকে মায়ের

সম্পত্তির অছি হতে হয়। এই দায়িত্ব পাবার পর গঙ্গা প্রতি মুহূর্তে সন্ধান করতে থাকে তাদের পরিবারে বিধুশেখরের প্রতিপত্তি খর্ব করার উপায়। এই সময় মনের অশান্তি মেটাতে সে ব্রাহ্মদের সভা সমিতিতে যোগ দিতে থাকে। বন্ধু রাজনারায়ণের অনুরোধ ও নিজের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে পারে না এই ধর্ম। গঙ্গানারায়ণ যদি বারাঙ্গনা বিলাসে মত্ত হয় মা বিম্ববতী মেনে নেবেন, এই বিষয়ে এস্টেট থেকে অর্থ ব্যয় করলেও কোন বাধা দেবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। যারা ঠাকুর দেবতা মানেন না, তাদের মুখ দেখাও বিম্ববতীর কাছে পাপ, কিন্তু স্বামী পুত্রের বারবধূ গমন তার কাছে কিছুই নয়। ঔপন্যাসিক সুন্দর ভাবে তুলে ধরলেন উনিশ শতকের সমাজ মানসকে, চিনিয়ে দিলেন সময়ের স্বরূপকে।

ঔপন্যাসিক যে সময়কে তুলে ধরেছেন সেই সময়টি বাঙালীর সার্বিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সময়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় 'ইয়ংবেঙ্গল' হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন, যাঁরা বাঙালী সমাজের সমস্ত রকম প্রথা সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন, নিজ মাতৃভাষাকে ঘৃণায় অবজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরাই মধ্যবয়েসে পৌঁছে বুঝেছেন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিদ্রোহ সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের দেশের সম্পদ গুলোকেও চিনতে হয়, নিজের মাতৃভাষাকে সম্মান করতে হয়। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্যরা কর্মসূত্রে একজন এক জায়গায় থাকেন। রাধানাথ সিকদার দেরাদুনে সরকারের জরিপ বিভাগে কর্মরত ছিলেন, পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন সেই সময়ে আবার সমস্ত বন্ধুবর্গ মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল। রাধানাথ সিকদার, প্যাঁরীচাদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা মিলিত হয়েছেন রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে। রাধানাথ বহুদিন প্রবাসে থাকার ফলে বাংলা ভুলে গেছেন, তিনি দেখে অবাক হয়েছেন তার যে বন্ধুরা

যৌবনে বাংলাকে ঘৃণা করেছেন তাঁরাই আজ প্রবল সম্মানের সঙ্গে মাতৃভাষার জয়গান করছেন, ঈশ্বরচন্দ্রের লেখার সমাদর করছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাংলা রচনাভঙ্গী দেখে আপ্লুত হয়েছেন, হিন্দুধর্মের যে সংস্কার সাধন করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করে তার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বুঝেছেন নব্যশিক্ষিত যুবকেরা যেভাবে খ্রীষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তা এইদেশের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। তাঁরা আরও বুঝেছেন নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের বিধান না হলে এই দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। মুক্তমনা এই পুরুষটি ভারতবর্ষে এসে দেখলেন ইংল্যান্ড থেকে তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি বুঝলেন, ইংল্যান্ডের জনসাধারণের ধারণা অধঃপতিত ভারতীয়দের উদ্ধার কার্যেই ব্রিটিশ জাতি নিহিত কিন্তু প্রকৃতচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি দেখলেন শিক্ষা, আইন, ব্যবসা বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতবাসীরা না বুঝেই শোষিত হচ্ছে। তিনি অবাক হলেন যখন দেখলেন ভারতবাসীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে না, শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে গর্বিত হয়। তিনি বুঝলেন ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এদেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হয় না, তাই তাদের আত্ম উপলব্ধি ঘটে না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ক্যপটিভ লেডি’ দেখে বীটন অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন একজন বাঙালী কবি মাতৃভাষা ছেড়ে কবিতা লিখেছেন ইংরেজীতে, একজন ইংরেজ যতই ভাল ফরাসী জানুক সে কখনই ভাবতে পারে না মাতৃভাষা ছেড়ে ফরাসীতে কবিতা লিখবে। তাঁর মতে ভারতবাসীরা যতই শিক্ষিত নিজেদের ভাবুক না কেন তারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত নয়, কারণ তাদের আত্মোপলব্ধি হয়নি। বেথুন সাহেব এদেশে আসার পর থেকে নানা রকমভাবে এদেশের মানুষদের নিয়ে ভেবেছিলেন।

তাঁর দেশে যেভাবে নারীরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তারা সভা সমিতি করছে, তার বিপরীতে এদেশের নারীদের অবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন।

এই সময়ে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী তাঁদের শিক্ষার গোড়ার দিকে নিজের দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভুলে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন এদেশের সবকিছুই কুসংস্কারে ভরা। মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ধীরে ধীরে তাদের সেই ভুল ভাঙে, তাঁরা সন্ধান পান সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্যের, তাঁরা বুঝতে পারেন মাতৃভাষার গুরুত্ব। মদনমোহনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে সংস্কৃত পন্ডিতদের মধ্যেও এমন মুক্তমনা মানুষ থাকতে পারে। রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা বেথুন সাহেবের পরিচয় হলে তাঁরা বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখেন বেথুনের কাছে। বেথুন সাহেব নিজেও এই বিষয়ে ছিলেন প্রবল উৎসাহী কিন্তু ইংরেজ রাজসরকারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সমস্তরকম সাহায্য করতে রাজী হলেন। মদনমোহন নিজের দুটি শিশুকন্যাকে এই বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি ছাত্রী হিসাবে ভর্তি করতে রাজী হলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মির্জাপুরের বৈঠকখানা বাড়ি দিয়ে দিলেন স্কুল ভবনের জন্য। তাঁদের সকলের প্রচেষ্টায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুভ সূচনা হল এদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের। সালটি ১৯৪৯। প্রথমদিনে স্কুল শুরু হয়েছিল একুশটি বালিকা নিয়ে। শহরের বহু মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও বহু পত্রপত্রিকা নিন্দামন্দ ও কুৎসা রটনা করতে লাগল। এই কুৎসার ফলে হোক বা শহরের থেকে মীর্জাপুরের দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে হোক কিছুদিনের মধ্যে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা সাত জনে এসে পৌঁছল। বেথুন সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে শহরের কেন্দ্রে হেদুয়ায় সরকারের কিছু জমি মির্জাপুরের

সমস্ত জমির বিনিময়ে নিয়ে নতুন স্কুল গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এই নতুন স্কুল ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বেথুন সাহেবের মৃত্যু হল। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলেন এই স্কুলের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই স্কুলটি 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হয়ে গেল।

নবজাগরণের যুগে হিন্দু কলেজ হয়ে উঠেছিল বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান, কিন্তু হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ সকলের জন্য ছিল না। শুধুমাত্র হিন্দু ছেলেরাই এই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেত এবং তাদেরও প্রয়োজন হত বংশ গৌরব। উপন্যাসে বেশ্যা হীরা বুলবুল তার পুত্র চন্দ্রনাথকে ভর্তি করতে চেয়েছে হিন্দু কলেজে। হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা যাঁরা হিন্দু কলেজের চেয়ারপার্সন তাঁদের রাজী করানো প্রায় অসম্ভব। হীরা বুলবুলের একমাত্র সহচর রাইমোহন চন্দ্রনাথের বুদ্ধি দেখে তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হীরেমণিকে সে নানা ভাবে বুদ্ধি দিয়েছে ছেলেকে ভর্তি করার উপায় খুঁজতে। দেশীয় সম্ভ্রান্ত বাবুদের পায়ে ধরেও যখন কোন ফল হয়নি, তখন রাইমোহনের বুদ্ধিতে হিরেমণি ছেলের হাত ধরে হাজির হয়েছে হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের শিক্ষালাভের অধিকার আছে, ইংরেজ সদস্যরা মনে করেছে হিরেমণি হিন্দু রমণী সুতরাং তার ছেলেকে ভর্তি নিতে হিন্দু সদস্যদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। হিন্দু সদস্যরা কিন্তু চন্দ্রনাথকে কোনভাবেই ভর্তি করতে রাজী হননি। ইংরেজ সদস্যরা চন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিয়ে তাকে এই কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু যে সব বাবুরা রাতের অন্ধকারে হীরেমণির মত নারীকে ভোগ করতে দ্বিধা করেন না, তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনে দ্বিধান্বিত হন না, তারাই সেই সন্তানদের 'জারজ' আখ্যা দেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজের এই অদ্ভুত শুচিবায়ুতার কারণে এই ছেলেটি ভর্তি হবার পর থেকেই কলেজে ছাত্র সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। পতিতার ছেলের সঙ্গে একত্রে বসে শিক্ষালাভ করতে এতটাই ভীত বাঙালী সমাজ যে রাতারাতি স্থাপিত হয়েছে 'হিন্দু

মেট্রপলিটন কলেজ'। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে পাওয়া যায় সময়টা ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ।

ঔপন্যাসিক দেখালেন, একদিকে যে সমাজে ভদ্রসম্ভ্রান্ত পুরুষেরা প্রকাশ্যে বেশ্যা বিলাসে মগ্ন থাকতে পারেন এবং কোন লজ্জা বোধ তাদের মধ্যে কাজ করেনা, সেই সমাজেই ভদ্রপরিবারের সন্তানেরা বেশ্যাপুত্রের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসে শিক্ষাগ্রহণ করে না। শহরের গণ্যমান্য লোকেরাই উদ্যোগ নিয়ে রাতারাতি স্থাপন করে ফেলে নতুন বিদ্যালয়। বেশ্যাপুত্র কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কমতে শুরু করে, কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা কোনভাবেই এই ছেলেটিকে পাঠদানে রাজী হয়নি। শুধুমাত্র ইংরেজ শিক্ষকরা প্রবল উদ্যমে এই মেধাবী ছেলেটিকে পড়িয়ে যান; কিন্তু শেষরক্ষা হয় না, ছাত্রসংখ্যা কমে যেতে থাকায় বাধ্য হয়ে কলেজ থেকে একদিন বিতাড়িত হতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে। একটি সম্ভাবনাময় বালকের জীবন সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যায়। শুধু বালকের জীবনই নয়, ভেঙ্গেচুরে খানখান হয়ে যায় শহরের নামী বেশ্যা হীরেমণির জীবনও। স্কুল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে চন্দ্রনাথ মায়ের প্রতি প্রবল আক্রোশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সমাজের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও মায়ের প্রতি ঘৃণায় সে আশ্রয় নেয় শ্মশানের ডোমদের মধ্যে। নিজের একমাত্র সন্তান হারিয়ে হীরেমণিও বজায় রাখতে পারে না নিজের স্বাভাবিক জীবন, বেশ্যা রমণীর মধ্যেকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে। সন্তান শোকে পাগলিনী নারী চায় বেরিয়ে পড়তে। তীর্থ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজের সেই পাপকে স্খালন করতে চায়, যে পাপ তার নয়, তা একান্তই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক বানিয়ে তোলা ও চাপিয়ে দেওয়া। সমাজ নারীকে কোনো আশা করার অধিকার দেয়নি, দেয়নি নিজের মত করে বাঁচার অধিকার, আর এই নারী তো পতিতা। বজরা করে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে তাকে করতে হয় নরক দর্শন। অর্থ লোভী কিছু দস্যু তার বজরা লুঠ করে ধর্ষণ ও বিবস্ত্র করে তাকে ছুড়ে ফেলে যায় নদীর

ধারে। পতিতা হীরা বুলবুলের চির অন্ধকারময় জীবন প্রবেশ করে এক গাঢ় অন্ধকারের গহ্বরে। সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে একদিন আত্মঘাতিনী হয় সে। সমাজের প্রবল শোষনে ধ্বংস হয়ে যায় এক নারীর জীবন। আসলে একটি মাত্র জীবন নয়, সমাজ যেখানে ব্যক্তির চেয়ে বড়, সেখানে এভাবেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে শতকোটি নারী, শতকোটি মানুষ, ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের সেই সময়কেই চেনাতে চেয়েছেন, তুলে আনতে চেয়েছেন সময়কে, যেখানে প্রতিটি ঘটনা সেই সময়েরই প্রতীক।

বেথুনের মৃত্যুর পর থেকে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বেথুন সাহেব বারবার যে কথাটা বলেছিলেন সেটি হল, আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। বিদ্যাসাগর বেথুনের ভাবনাকে মাথায় রেখে ইংরেজ সরকারের কাছে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশদ পরিকল্পনা পেশ করলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর ইংরেজ সরকারের মঞ্জুরি পাওয়া গেল। সংস্কৃত কলেজের দায়িত্বের ওপর বিদ্যাসাগর নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব। তিনি গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে লাগলেন গ্রামের মানুষ যদি একখণ্ড জমি দেয় এবং নিজেরা চাঁদা তুলে একটি বাড়ি তুলে দেয় তাহলে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়। শিক্ষকদের বেতন দেবে সরকার। প্রায় সমস্ত জায়গায় তিনি সার্থক হতে লাগলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বুঝলেন শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করে গেলেই কোন উদ্দেশ্য সাধন হয় না, তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষক। ছাত্রদের মতো শিক্ষকদেরও আগে গড়েপিটে নিতে হবে, আর সেই জন্য স্থাপন করতে হবে নর্মাল স্কুল।

উপন্যাসে দেখা গেছে যখন তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রবল উদ্যোগী সে সময়েই একদিন বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে গিয়ে শুনলেন তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন

এবং সেই সঙ্গে তিনি বিধবা করে গেছেন ছয়টি রমণীকে, তার মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠাটির বয়স নয়। সেই সঙ্গে আরও শুনলেন তাদের প্রতিবেশীর কন্যা এগারো বছরের সত্যভামা বিধবা হয়েছে। অবোধ বালিকাদের এই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিধান শাস্ত্র থেকে খুঁজে বের করার পণ গ্রহণ করলেন। গোটা সমাজ তাঁর বিরোধিতা করলেও তিনি থামবেন না, এই অঙ্গীকার তিনি নিজের কাছে করলেন। বিদ্যাসাগর মানসিকভাবে ছিলেন আপামর বাঙালীর থেকে বহুবছর এগিয়ে। তিনি বাঙালী সমাজকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের সুবর্ণভূমিতে। যেখানে নবজাগ্রত ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী জেগে উঠবে নতুন প্রভাতে।

উপন্যাসে নবীনকুমার যখন চতুর্দশ বর্ষীয় যুবা সেই সময় থেকেই তার মনে সমস্ত কিছুকে যাচাই করে দেখার প্রবণতা জাগতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে শহরের নানা রকম হুজুগের বিবরণও উপন্যাসে আছে। নবীনকুমার যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র সে সময়ে কলকাতার এক ধনী বাড়িতে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই মহাপুরুষের নামে গুজবের শেষ নেই। বিম্ববতীও সেই মহাপুরুষের পায়ের ধুলোর মাদুলি বানিয়ে নবীনকুমার ও গঙ্গনারায়ণের জন্য রেখেছিলেন। নবীনকুমার তার কিশোর বয়স থেকেই সমস্তকিছুকে যাচাই করার মানসিকতা অর্জন করেছিল, তার মনে হয়েছিল ভূকৈলাসের বাড়িতে যে মহাপুরুষ এসেছেন তাকে যাচাই করতে হলে তার নাকের কাছে নস্যি ধরলেই হবে। অর্থাৎ নব্যযুবকেরা ধীরে ধীরে মুক্ত হতে শুরু করেছিল ধর্ম সংক্রান্ত কোনও সংকীর্ণতা কিংবা অন্ধবিশ্বাস থেকে।

রাধানাথ সিকদার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে প্রথম যৌবনে সর্বোতভাবে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করার নেশায় মেতেছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই চাকরিসূত্রে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দেশের নানা স্থানে।

দীর্ঘকালবাদে যখন তিনি ফিরে আসেন। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে পাওয়া যায় মাত্র ১৯ বছর বয়েসে তিনি Great Trigonometric Survey তে computer হিসাবে ত্রিশ টাকা বেতনে যোগ দিয়েছিলেন, এই কাজে যোগদানের অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় ২০ বছর প্রবাসে কাটানোর পরে ১৮৫১ সালে তিনি বদলি নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি দেখলেন তাঁর বন্ধুদের ভাবনা-চিন্তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকে বাংলাভাষা প্রায় ভুলে গেছেন। তাঁরা কিশোর বয়স থেকেই বাংলাকে ঘৃণা করতেন। দেশে ফিরে দেখলেন তাঁর বন্ধুরা নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষাকে আবার নতুন শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার আবেগে মেতে উঠেছেন। তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। কলকাতায় বদলি হবার পর তাঁর জীবনে ঘটেছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতা মাপতে গিয়ে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তিনি বহু বছর যাঁর অধীনে কাজ করেছেন সেই জর্জ এভারেস্টের নামে নামকরণ করলেন এই পৃথিবীর চূড়ার। এত বড় একটা কাজের তেমন শিরোপা ইংরেজ সরকার তাঁকে দিল না, কিন্তু তা নিয়ে তিনি কোনরকম হইচই করতে রাজী হলেন না, তিনি মনে করলেন নিজের ভালোর জন্য লড়াই না করে সেই সময়টুকু যদি দেশের কাজে দেওয়া যায় তাহলে এই দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হবে।

উপন্যাসের ‘দ্বিতীয় পর্ব’ -এর সূচনা করেছেন ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের অন্যতম হুজুগ বুলবুলির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। নবীনকুমার এইসময়ে পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবক। উপন্যাসে তিনি এসেছেন ছাতুবাবুর মাঠে বুলবুলির লড়াই দেখতে। এই ভাবে দেশের মানুষদের অহেতুক কৌতুকে মজতে দেখে নবীনকুমারের মনে হয়েছে “দেশটা ধনী মর্কটে ছেয়ে গ্যেচে, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ইংরেজ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে সব।... বুলবুলি লড়াইয়ের এত নামডাক শুনিচি, তা কিনা এই!”[২০]

নবীনকুমার বুলবুলিদের চড়াদামে কিনে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছেন যা কিছু পুরাতন তার সবটুকুকে। ছাতুবাবুর মাঠের লোকেদের কাছে তা মূল খেলার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেন নতুন যুগের পদধ্বনিতে পুরোনো সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত আবর্জনাকে খাঁচা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছেন নবীনকুমার এবং দেশের আপামর জনসাধারণ সামিল হয়েছে এই নবযুগকে আহ্বানের যজ্ঞে। নবীনকুমার নিজের বাড়িতে শুরু করেছেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। এর সদস্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরিশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যায় মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিদ্যোসাহিনী সভা'। উপন্যাসে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানার্জনের পথে যখন এগোচ্ছেন নবীনকুমার তখন বিধুশেখর ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি বারবণিতা বিলাস, মদ্যপানের পথে না গিয়ে ধনী সদ্যযুবকের নিষ্পাপ জ্ঞানচর্চাকে। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াই যখন ছিল তথাকথিত ভাবে জ্ঞানী হওয়ার প্রমাণপত্র, সেই সময়ে নবীনকুমার বুঝেছেন ব্রাহ্ম সমাজের অসারতা। কেশব সেন ও তার অনুগামীদের ইংরেজী ভাষার প্রতি অন্ধ অনুরাগ তাকে বীতরাগী করছে এই ধর্মের প্রতি। কেশব সেনের বিদ্যাচর্চার আসরে বক্তৃতা দেওয়া হয় ইংরেজিতে, ধর্মালোচনাও হয় ইংরেজিতে। এই নির্লজ্জ পরানুকরণ নবীনকুমারের পছন্দ হয় না। অর্থাৎ নবীকুমারকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক যাচাই করেছেন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে। দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'ব্রাহ্মধর্ম'এর পরিবর্তনকে।

উপন্যাসে নবীনকুমার বলেছেন, "বাঙালীরা ধর্ম বিষয়ক আলোচনাও করছে ইংরেজিতে, হায়!"[২১]

উপন্যাসে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে লেখক যুগের বৈপরীত্যকে ধরেছেন। সংবাদপত্রের পাতায় যিনি ক্ষুরধার লেখনীতে আগুন জ্বালান, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক বাণী বর্ষণ করেন, তিনিই সংসারে মা ও স্ত্রীর কলহে বীতশ্রদ্ধ এবং প্রবল নারীবিদ্বেষী। প্রচুর মদ্যপান ও বহুনারী সঙ্গ করতে তিনি দ্বিধাহীন। উপন্যাসে নবীনকুমার এই হরিশের কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন মদ্যপানের। নারীসঙ্গলিপ্সা তার না থাকলেও জড়িয়ে পড়েছেন এই ঐতিহ্যের বাঁধনে। একদিন পিতার রক্ষিতা কমলাসুন্দরীর ঘরে রাত কাটানোর পর তিনি সম্বিত ফিরে পান। পুরোনো ঐতিহ্যের বাঁধন হয়তো এই ভাবেই ভেঙে পড়ে। বিদ্যাসাগরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিজের পাপ স্খালন করতে নেমে পড়েন বিশাল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদের যজ্ঞে। শিকড় থেকে রসদ নিয়েই তিনি এগিয়েছেন বিবর্তনের পথে। নবীনকুমারই সময়ের প্রতীক তাই সময়ের দ্বিধা দ্বন্দ্ব তার মধ্যে রয়ে গেছে শেষ দিন পর্যন্ত। ঔপন্যাসিক বলতে চেয়েছেন, ইংরেজ শাসনের দীর্ঘপথ পেরিয়ে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পার করে, নবীনকুমারের পনেরো বছর বয়স পেরিয়ে অর্থাৎ ১৮৫৫ সাল পেরিয়ে বাঙালী শিখেছিল পুরোনো প্রথাকে বিসর্জন দিতে। নারীসঙ্গ ও মদ্যাসক্তির ধারাকে বর্জন করতে।

‘বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্ববিষয়ক প্রস্তাব’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৫৫) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে প্রবল ঝড় উঠেছিল। বিপক্ষদলের ব্রাহ্মণরা দলে দলে কলম ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত কলমকে তরবারিতে পরিণত করার ক্ষমতা সকলের নেই, তাছাড়া প্রতিপক্ষের পণ্ডিতেরা যখন শাস্ত্রের নানা যুক্তিকে তুলে ধরে তাঁকে পরাস্ত করতে চাইলেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র নিয়ে এসেছিলেন বিবেকের সমর্থন। যুক্তিতে হেরে সনাতন পন্থীরা বেশি উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে মেরে ফেলার পর্যন্ত পরিকল্পনা

করেছিলেন। সেই সময়ে এদেশের কিছু ভন্ড সমাজ সংস্কারক যারা প্রকৃতপক্ষে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতার কথা মুখে বলে কিন্তু আসলে নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখেন, তারা বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে নানা রকম কুরুচিকর আলোচনায় মেতেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের নারীমুক্তির পথিকৃৎ। তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বা বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা কিংবা বহুবিবাহ রোধের চেষ্টার পথে প্রচুর বাধা এলেও তিনিই কাণ্ডারী হয়ে ভারতীয় সভ্যতার নৌকাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পৌঁছেছিলেন। একের পর এক ছাত্রপাঠ্য বই, বর্ণপরিচয়ের নানা ভাগ এগিয়ে নিয়ে গেছিল বাঙালীকে সময়ের অন্যপারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বিলেত যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়ার পরেও তাঁর নেটিভ আখ্যা ঘোচেনি। তিনি কলকাতা থেকে মাদ্রাজে চলে যান, সেখানে গিয়ে তার ভাগ্যোন্নতি ঘটেনি, সামান্য শিক্ষকতার চাকরি তাকে নিতে হয়েছিল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ এই দীর্ঘ আট বছর মাদ্রাজে কাটানোর পর তিনি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের আশায় বন্ধু গৌরদাসের প্রচেষ্টায় দেশে ফিরলেন। হিন্দুকলেজে পড়ার সময় থেকেই মধুসূদন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, তিনি বলতেন বাংলাভাষা ভুলে যাওয়াই ভালো, দীর্ঘদিন মাদ্রাজ প্রবাসের পরে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাই যেন পূর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তিনি বাংলা প্রায় ভুলে গেছেন, দুই একটি শব্দ যেটুকু মনে রেখেছেন সেটুকুও ভাঙা ভাঙা ও বিকৃত উচ্চারণে পূর্ণ। তিনি যৌবনে যে মানুষদের দেখেছিলেন ইংরেজীর স্তাবকতা করতে, দেশে ফিরে দেখলেন তারা এখন ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হলেও কথা বলেন বাংলাতে, দেশের যেসব মানুষেরা একদিন মহা শোরগোলের সঙ্গে পাশ্চাত্যর সমস্ত কিছু ভালো মন্দকে গ্রহণ করেছিলেন তারাই মেতেছেন বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে। প্যারিচাঁদ

মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সহজবোধ্য পত্রিকা প্রকাশ করছেন, চলিত কথ্য ভাষায় প্যারিচাঁদ মিত্র লিখছেন 'আলালের ঘরের দুলাল'; এসব মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেনে নিতে পারেননি। এইসময়ে তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য পবিত্র জিনিস, তাকে সাধারণের স্তরে নামিয়ে আনা অনুচিত। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সংস্কৃত থেকে প্রচুর শব্দ আমদানি করে তিনি কুৎসিত বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটাবেন এবং তাঁর সৃষ্ট ভাষাই এদেশে চিরস্থায়ী হবে।

উপন্যাসের প্রবাহ পথে ঔপন্যাসিক সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন দুটি স্রোতের ধারা, একদিকে পুরনো প্রথা সংস্কারে আবদ্ধ জীবন; অন্যদিকে এই সমস্ত থেকে বেরিয়ে আসার সচেতন প্রয়াস। সমাজের সমস্ত পুরনো আগলগুলো ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রয়াস। একদিকে হাটখোলার মল্লিক বাড়ির চণ্ডিকাপ্রসাদ ও কালিকাপ্রসাদ নব যুগের আদব কায়দাকে গ্রহণ করেনি, তারা মদ্যপান ও নারীবিলাসের মধ্যদিয়েই নিজেদের সম্পদের সদ্বব্যবহার করেছে, ঘরে নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে বাইরে নারীর প্রতি আসক্তি, মদ্যপান, স্ত্রীপ্রহার প্রভৃতি গুণের সমারোহে এরা ধরে রেখেছে পুরাতন যুগকে। কলকাতার ধনী পরিবারে বহুবিবাহের চল না থাকলেও অন্তঃপুরে এক স্ত্রী মরলে আবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যেতে সময় লাগে না। "কলকাতার ধনী পরিবারের নিয়ম এমনই যে বাবুদের বাইরে যে–কটি রক্ষিতা থাকুক না কেন, বাড়িতে একটি স্ত্রী রাখতেই হবে।... বাবু হয়তো মাসের মধ্যে একদিনও রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করেন না। কিন্তু অন্তঃপুর শূন্য রাখা চলবে না। বাড়িতে একজন কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি না করলে রক্ষিতালয়ে আমোদ ঠিক জমে না।"[২৩] অন্যদিকে এই পরিবারের অন্তঃপুরেই বাসা বেঁধেছে আধুনিক যুগের বীজ। চন্ডিকাপ্রসাদের স্ত্রী দুর্গামণি চন্ডিকা প্রসাদের তৃতীয় পক্ষ। "চন্ডিকাপ্রসাদের... প্রথমা পত্নী মারা গেছে বিবাহের দু বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয়া পত্নী এ গৃহে এক বছর অবস্থান করেই আত্মঘাতিনী হয়েছিল।

দুর্গামণি কান্নাকাটি কিংবা আত্মঘাতিনী হবার মতন পাত্রীই নয়। সে অতিশয় তেজস্বিনী ও আত্মসম্মানসম্পন্না যুবতী। তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখেছিল। তার নরাধম স্বামীকে সে প্রথম দিকে সুপথে আনার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এখন সে পারতপক্ষে তার স্বামীর মুখ দেখতে চায় না।"[২৪] দুর্গামণি তার সময় থেকে বহু বছর এগিয়ে। যে সময়ে নারী অন্তঃপুরচারিনী, স্বামীগতপ্রাণা, স্বামীর মৃত্যুতে তাকে বৈধব্যের আগুনে দগ্ধ হতে হয় পুরো জীবন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে দুর্গামণি বলতে পেরেছে, "তুই তো জানিস, আমি মাচ মাংস ভালোবাসি না। উনি গেলেন কি রইলেন তাতে আমার ভারি এলো গেল।"[২৫] দুর্গামণি নিজের হাতে পত্র লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে, বিধবা বিবাহের প্রতি তার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। স্বামীর বহুনারী সংসর্গের কারণে অসুস্থ অবস্থায়ও তাকে ছুঁতে চাননি, কুসুমকুমারী তার পাগল স্বামী অঘোরনাথের মত্ত অবস্থা দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে সেই পাগলের পা জড়িয়ে ধরে ভগবানের কাছে তাকে সুস্থ করে দেওয়ার প্রার্থনা জানালে অঘোরনাথের পায়ের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ে কুসুমকুমারীর মাথা ফেটে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গামণি অকপটে বলেছে, "আমার কাছে বিষ আছে, তুই খাওয়াতে পারবি?... ও পাগল আর কোনদিনও ভালো হবে না। তুই বিধবা হ, তোর আমি আবার বিয়ে দেবো। তোর জন্যই তো আমি সাগরকে চিঠি দিয়েচি!... বুকে সাহস আন কুসোম! ভালো করে বাঁচতে শেক। মাতাল, পাগল - এদের সঙ্গে আমরা কেন ঘর করবো? আমাদের সাধ আহ্লাদ নেই!"[২৬] উনিশ শতকে নারী কীভাবে চিরায়ত সংস্কারের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে নারী ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল নিজের জন্য অর্ধেক আকাশ সেই অবস্থানটিকেই এখানে চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক, চিহ্নিত করেছেন সেই এক চিলতে আগুনকে যে আগুন আজ প্রতিটি নারীর হাতের মশালের রূপ নিয়েছে।

যে সময়ে একদিকে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজে ধর্মকে নিয়ে সংকীর্ণতা

দূর হচ্ছিল, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ও ব্রাহ্মণদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে নির্মাণ করছিলেন নতুন মন্দির। যে সময়ে সমাজ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না, সেই সমাজে শূদ্র রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। বর্ণের চেয়ে বড় কর্ম, বিধানের চেয়ে বড় নিধান সেই সত্যকে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মদের নিরিশ্বরবাদ, খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের মরশুমে দাঁড়িয়ে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সনাতন হিন্দু পৌত্তলিকতাকে। হিন্দু বাঙালীকে তিনি এগিয়ে দিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

যে সময়ে বাঙালী হিন্দু সমাজে একটা নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে, সেই সময়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ রেখেছিল এই সমস্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে যোগ দেওয়ায় একটা বিশেষ বৃত্তিধারী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, সেই নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মুসলমান ছিল নগণ্য। হিন্দুসমাজ যখন বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, বহুবিবাহ রদের আন্দোলনে নেমেছে, মুসলমান নারী সমাজ তখনও অতি কঠিন পর্দাপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়নি, হিন্দু সমাজের একাংশ যখন ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসকে আত্মস্থ করছে, মুসলমান সমাজ তখন ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে নবাবী শাসন ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ইয়ংবেঙ্গল দলের শ্রীশচন্দ্র বিয়ে করছে এগারো বছরের বিধবা কালীমতীকে, বারবণিতাকে আবার সুন্দর সুস্থ মঙ্গলময় জীবনে ফিরিয়ে দিতে চাইছে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ, অন্যদিকে সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা বারবনিতা বিলাসের থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ কলকাতায় আসাতে মুসলমান সমাজ যেমন পরাজয়ের গ্লানিতে মর্মাহত হয়েছে, হিন্দুদের

একাংশ পেয়েছে একটা নতুন হুজুগ, নতুন বিষয় নানা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য গল্প ফাঁদার জন্য। রাধাকান্ত দেব বিরোধিতা করছেন বিধবাবিবাহ আইনের, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এসে দাঁড়াতে চাইছেন না বিধবাবিবাহ আসরে। বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা রকম রসালো আলোচনা চলছে কোন কোন মহলে। বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা রসালো আলোচনা বা মড়া ফেরার হুজুগেই শেষ হয়েছে বাঙালীর শক্তি।

এই চরম বিপরীত স্রোতের মাঝেই বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছে প্রথম বিধবাবিবাহ। ১৭৭৮ শকাব্দ বা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বিবাহ করেছেন বিধবাকন্যা কালীমতীকে। প্রবল ইংরেজি আনুগত্যের যুগেই নবীনকুমার বাংলায় অনুবাদ করছেন কালিদাসের ‘বিক্রমোবর্শী’ নাটক। ইংরেজ শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করার আশায় সিপাহীরা গর্জে উঠছে বার বার। মঙ্গল পান্ডে ও ঈশ্বরী পান্ডে প্রথম ঘোষণা করেছেন ‘আংরেজের দিন শেষ হয়ে এসেছে।’[২৭] মঙ্গল পান্ডের ফাঁসির পর সিপাহীরা জ্বলে উঠে বৃদ্ধ নবাব বাহাদুর শাহকে আবার স্বাধীন নবাব ঘোষণা করলে সেই সময়ে দিল্লী কিছুদিনের জন্য হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে নব্যবঙ্গ সমাজ সিপাহীদের সমর্থন করতে পারেনি। মুসলমান সমাজ মনে মনে মোঘল সাম্রাজ্যের পুনর্প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও হিন্দুসমাজ বিশেষত হিন্দু বাঙালী সমাজ সিপাহীদের জয়ের পর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে পারেনি। ডিরোজিও শিষ্যকুলের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সিপাহীদের উত্থানের সমর্থক হলেও প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদারেরা মনে করেছেন ইংরেজ শাসন আশীর্বাদ স্বরূপ। ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র পক্ষ থেকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, “বর্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ইংরেজদের অনেক দোষ আছে সত্য, তবে ইংরেজরা এদেশে মোটামুটি

সুশৃঙ্খল, সভ্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তার বদলে শিক্ষাহীন, নীতিহীন সিপাহীদের শাসন চালু হলে দেশে চরম দুর্দিন আসবে, চরম অরাজক অবস্থা চলবে।”[২৮]

উপন্যাসে নবীনকুমার বিদ্যোৎসাহিনী সভার মত মেনে ইংরেজদের গুরুত্ব বুঝে নিলেও রাতে স্বপ্ন দেখেছে, “সেপাইরা ইংরেজদের মারচে, ইংরেজরা ভয়ে হাউ মাউ কচ্চে, তখন আমার খুব আনন্দ হলো। আমি আনন্দে নাচতে লাগলুম।”[২৯] বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার পরে বাঙালী সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানালো হলেও বাঙালী সমাজ তাদের জন্যই প্রথম অনুধাবন করেছিল স্বাধীনতার অর্থ। নবীনকুমার ভেবেছে সবাই মুখে সেপাইদের দোষারোপ করলেও কিন্তু এই যেকটা মাস দিল্লি স্বাধীন ছেল, ভারতবাসী যেন মনে মনে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক ইংরেজ আমাদের বিজাতি, তাদের অধীনে পরাধীন হয়ে থাকা আমাদের বুকের উপরে একটা পাষাণভার রাখা। আবার এই একই সময়ে লক্ষ্ণৌ এর নবাব বাদশাহ শাহ জাফর যখন শুনেছেন সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ দখল করেছে, লক্ষ্ণৌ আবার স্বাধীন হয়েছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও তিনি নিজের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন নি, তিনি ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দিলেন বিদ্রোহীদের খবর। ডুব দিলেন নিজের বিলাসের জীবনে। ইংরেজ সরকার তাকে আশ্রয় দিল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। যেই মুসলমানেরা নবাবকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা গ্রেপ্তার হলেন ইংরেজদের হাতে। সময় এগিয়েছিল এই বৈপরীত্যকে সঙ্গে নিয়েই।

উপন্যাসে নবীনকুমারের উদ্যোগে ‘বিক্রমোবর্শী’ নাটকের অভিনয়ের পর, কলকাতার ধনী সমাজে নাটক অভিনয় শুরু হয়েছিল ইংরেজী আদলে। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলা ক্রয় করে শুরু করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয়। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদের

অনুরোধ নিয়েই গৌরদাস বসাক হাজির হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে। উপন্যাসে মধুসূদন গৌরদাসের এই প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে জানিয়েছেন, "আমি ট্রান্সলেট করব বাংলা থেকে ইংলিশে? বড় ভাষা, গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ছোট ভাষায় ট্রান্সলেসান হয়। যেমন হয় ইংলিশ থেকে বাংলায়।"[৩০] এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা পার করেই বাঙালী পৌঁছেছিল আত্ম অনুসন্ধানের আঙিনায়। এরপরই মধুসূদন আসতে শুরু করলেন 'রত্নাবলী'র মহড়ায়, বাংলায় নাটক রচনায় উৎসাহী হয়ে তিনি মহাভারতের কাহিনী ঘেটে লিখে ফেললেন প্রথম বাংলা সার্থক নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। ইতিহাসের পাতায় সালটা ১৮৫১। বাংলা সাহিত্য তার মধ্যযুগের নাড়ী কেটে বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে ক্ষুরধার হয়ে, মধুসূদনের লেখনী একযোগে একশ বছর এগিয়ে নিয়ে গেল বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীকে।

যে সময় মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখেছেন সেই সময়কালেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজ নীলকর সাহেবদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল নব্যসভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালী জাতির সামনে। সার্বিকভাবে উন্নত একটি নাটক না হলেও এই নাটকই নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই সময়ের শাসকবর্গকে। পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নামে এই নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার জানতে পারে এই নাটকে ইংরেজদের চরিত্রকে কতটা কালিমালিপ্ত করা হয়েছে, আর এর আসল অনুবাদক মধুসূদনকে না পেয়ে ইংরেজ সরকার পাদ্রী লঙ্ সাহেবকেই দিয়েছিল এক সহস্র মুদ্রা জরিমানা ও একমাস কারাবাস। প্রথমবারের মত কোন ভারতীয় নাট্যকার কিছুটা হলেও নাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ শাসককে। বোঝা গেয়েছিল ইংরেজ মাত্রই অপ্রতিরোধ্য নয়, বাঙালী এগিয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যদুপতি গাঙ্গুলি উপবীত ত্যাগ করে প্রথম বাঙালী সংস্কারবাদী ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। নিজে

ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বিধবা কায়স্থ সন্তানকে। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের বিধবাকন্যার সঙ্গে বংশগৌরবহীন যদুপতির বিয়ে দিতে রাজী হয়নি মেয়ের পরিবার। পাগল স্বামী অঘোরনাথের পা ধরে তার আরোগ্য কামনা করেছিল যে কুসুমকুমারী, সেই মেয়েটির পুনর্বিবাহ নিয়ে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নতুন আন্দোলন। বিধুশেখরের কন্যা সুহাসিনীর মুখ দিয়ে লেখক উচ্চারণ করেছেন সমস্ত বিধবা নারীর অন্তর্সত্যকে "গঙ্গাদাদা, দেশশুদ্ধ সব দুঃখিনী মেয়েরা তোমায় হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।"[৩১] সমাজ ভেঙেছে যেসব মানুষের জীবন, তারা ভাঙতে শুরু করেছিল সমাজের আগলকে।

বেশ্যা হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথও নিজের মানসিক ক্লৈব কাটিয়ে খুঁজে পেয়েছে নিজের পরিচয়কে, শপথ করেছে, "যে মানুষ অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে চায়, তার ক্রোধী ও জেদী থাকাই উচিত। দেকো, তোমাদের এই সমাজটার একদিন ঘাড় মটকাবো।"[৩২] সমাজের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তি। কিছুদিন রেলের কর্মচারী হিসেবে কাজ করার পর সেই কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নতুন ভাবে শুরু করেছে। চন্দ্রনাথ ওঝা হিসেবে সমাজের নানা অসংগতিকে খুঁজে পেতে থেকেছে। তথাকথিত সম্মানীয় মানুষদের মুখোশ খুলতে থেকেছে। চন্দ্রনাথের এই আত্ম অনুসন্ধান আসলে ঔপন্যাসিকেরই সময় সন্ধান। উপন্যাসে চন্দ্রনাথের বিবর্তনও আসলে সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনেরই প্রকাশ।

আসলে 'সেই সময়' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়েই 'সময়'কে স্পষ্ট করেছেন। তাদের জীবনসন্ধান ও আত্ম অনুসন্ধানের পথেই তিনি দেখিয়েছেন বাঙালীর মানসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস। নবীনকুমারের মধ্যেকার অসহায়তা, একাকীত্ব আসলে সেই সময়ের প্রতিটি জাগ্রত ও বোধ সম্পন্ন মানুষের সত্য। যে পথে নবীনকুমার নিজেকে সন্ধান করেছে, সমস্তকিছুর দিকে প্রশ্ন

ছুঁড়ে দিয়েছে, সমস্ত সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছে, চিনতে চেয়েছে নিজেকে, নিজের মধ্যেকার সুপ্ত পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাকে চিনতে না পেরে রক্তাক্ত হয়েছে, কিশোর বয়স থেকেই কখনও নাটক, কখনও অভিনয়, কখনও অনুবাদ, সভা, সমিতি, আবার কখনও বাড়ির অন্দরমহলে নারীদের সঙ্গে কৌতুক। রোগাক্রান্ত হয়ে কিছুদিন স্তিমিত থেকে নতুন করে নিজ শক্তির সন্ধান, বন্ধু হরিশচন্দ্রের সান্নিধ্য পেতে মদ্যাসক্তি, সুবালা নামের এক পতিতাকে আশ্রয়দান ও ব্যর্থতা, বিধবা কুসুমকুমারীকে বিবাহ বাসনা, বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হয়ে সেই সংকল্প পরিত্যাগ, হরিশের মৃত্যুতে তার পত্রিকার সম্পাদনা, চন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ ও তার সঙ্গে থাকা এক পতিতা নারীতে মাতৃমূর্তি দর্শন, বংশগৌরব বিসর্জন দিয়ে পতিতাপল্লীতে পায়ে হেঁটে ঘুরে চন্দ্রনাথের সন্ধান, কেন একই রকম রূপের দুই রমণীর একজন হয় স্নেহময়ী পুতচরিত্রা নবীনকুমারের জননী আর একজন বারনারী! এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান, মাতৃদর্শনের আশায় নদীপথে যাত্রা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, প্রকৃতির মধ্য থেকে মানুষে উত্তরণ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ, শেষে ঘটনাচক্রে দুলালচন্দ্রের পিতা যিনি স্ত্রী সন্তান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদ, যার পরিচয় জানতে পারেনি দুলালচন্দ্রও, সেই উন্মাদের কামড়ে বুকে ক্ষত নিয়ে ফিরে আসা, সেই ক্ষত বুকে নিয়ে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, চন্দ্রনাথ ও সেই রমণীকে খুঁজে পাওয়া, চন্দ্রনাথের কাছে চরম আঘাত, বুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতে মৃত্যু, মৃত্যু শয্যায় বেঁচে থাকার আশা প্রকাশ "আমার অনেক কাজ, আরও অন্তত তিরিশটা বছর বাঁচতে হবে, গুপুস গুপুস করে একশোটা টোপ পড়বে, নতুন সেঞ্চুরি আসবে, তখন দেখবে সাহেবরাও ফরফরিয়ে বাংলায় কতা বলচে–"[৩৩]। "একদিন আমি থাকব না, তুমি থাকবে না, অন্য মানুষ আসবে, পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে-"[৩৪] এই আশা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, এই সবই সময়ের বিবর্তনের ছবি। বাঙালী সমাজ সংস্কৃতির এগিয়ে চলার যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের পথে বাঙালী এইভাবেই আত্ম অনুসন্ধান চালিয়েছে, নিজের

সত্তার সঙ্গে সংঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে, খুঁজে পেয়েছে নতুন পথ, এগিয়েছে বিবর্তনের পথে, আত্ম আবিষ্কারের পথে হয়েছে উদ্বর্তিত, আত্মদর্শনের পথেই হয়েছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা।

তথ্যসূত্রঃ

১। ‘লেখকের কথা’ অংশ, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২। ‘লেখকের কথা’, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩। পৃ ২২, কথা বলেছেন প্রদীপ চৌধুরী, অতলান্তিক আমেরিকা, ১৯৮৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৪। পৃ ৭০৪, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৫। পৃ ২২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৬। পৃ ৬৯, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা ০৯

৭। পৃ. ২৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৮। পৃ ৪০, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৯। পৃ ৫৮-৫৯, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

১০। পৃ ২৯, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১১। পৃ ৩৪, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১২। পৃ ৩৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৩। পৃ ২৩, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৪। পৃ ২৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৫। পৃ ২৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৬। পৃ ৬৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৭। পৃ ৫৯১, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৮। পৃ ১৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৯। পৃ ১৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২০। পৃ ৩০৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২১। পৃ ৩৪৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২২। পৃ ৩৩৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৩। পৃ ৩৩৭, ৩৩৮ সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৪। পৃ ৩৩৮, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৫। পৃ ৩৪১, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৬। পৃ ৩৪৬ সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৭। পৃ ৪০২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৮। পৃ ৪১৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৯। পৃ ৪১৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩০। পৃ ৪৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩১। পৃ ৫৬৯, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩২। পৃ ৫৬২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩৩। পৃ ৬৯৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩৪। পৃ ৬৯৭, ৬৯৮, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ, কলকাতা ০৯